বাঙ্গালার হিন্দু

বাঙ্গালার হিন্দু

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্.এ., বি.এল্.
প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা
১৩৪১

প্রকাশক :
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

মূল্য ১।৷০ মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন
সখা প্রেস
৩৪নং মুসলমানপাড়া লেন
কলিকাতা

ভূমিকা

এই গ্রন্থখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ মাত্র। প্রবন্ধগুলি নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল—"আনন্দবাজার পত্রিকা", "বন্দে মাতরম্", "ভোটরঙ্গ", "শনিবারের চিঠি", "ছাত্র", "নব্যভারত", "পাঞ্চজন্য" ও "আর্থিক উন্নতি" পত্রে। রচনার তারিখ প্রতি প্রবন্ধের শেষেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের সম্মুখে, বিশেষতঃ হিন্দুজাতির সম্মুখে, যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে—সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, অর্থনীতিতে—এই প্রবন্ধনিচয়ে মোটামুটি তাহাই আলোচিত হইয়াছে। তবে দুই একটি প্রবন্ধ একটু অন্য ধরণের। "পুনরুক্তি" প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে; এবং "ব্যাঘ্রধর্ম্ম" প্রবন্ধটিতে বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক Nietzsche-র শক্তি-বাদ ও অতিমানব-বাদের তত্ত্বটি সুপরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত শক্তিসাধনার অনুকূল যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে—এই প্রবন্ধটি বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে লিখিত। আর "স্বাধীন ভারতে আড়াই দিন" লেখাটি কতকটা ব্যঙ্গাত্মক হইলেও উহার মূল বক্তব্য রাজনৈতিক আন্দোলন-বিষয়ক হওয়ায় অন্যান্য রাজনৈতিক প্রবন্ধের সঙ্গেই একত্র সন্নিবেশিত হইল।

সাময়িক ঘটনা বা সমস্যা অবলম্বনে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধগুলি রচিত হওয়ায় হয়ত কোথাও কোথাও পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়া থাকিবে, ছোটখাটো অসঙ্গতি থাকাও বিচিত্র নহে। তবে আশা করি এই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া পাঠক একটা মূলতঃ সুসঙ্গত চিন্তাধারার প্রবাহ লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ, যথা, "বাঙ্গালার হিন্দু", "হিন্দুস্থানে হিন্দুর স্থান", "অনুন্নত হিন্দু ও মহাত্মা গান্ধী," প্রভৃতি যখন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় তখনই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করিয়াছিল; এবং বহু বিশিষ্ট বন্ধু এই প্রবন্ধগুলিকে একত্র করিয়া প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইহাই প্রধান কারণ।

যে সব সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা হিন্দু-জাতির পক্ষে একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা। আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত এই সব বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা সুস্পষ্ট ভাবে এবং স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কাজেই গান্ধী-প্রমুখ অনেক রাষ্ট্রীয় নেতার কার্য্যাবলীর সময়ে সময়ে তীব্র সমালোচনা করিতে হইয়াছে। কাহারও প্রতি ব্যক্তিগত অসম্মান প্রদর্শন করা কিংবা কাহাকেও অশোভন আক্রমণ করা আমার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু রাষ্ট্র-নেতাদিগের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্যাবলীর নির্ভীক ও নিরপেক্ষ আলোচনা প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

কর্ত্তাভজা রাজনীতি ও সমাজনীতির যে কি শোচনীয় পরিণাম তাহা চতুর্দ্দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার পর মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং আজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা আবশ্যক; কারণ দাস-মনোবৃত্তি লইয়া স্বরাজ-সাধনা অসম্ভব। যদি এই প্রবন্ধগুলির দ্বারা দেশে স্বাধীন-চিন্তার উদ্রেক করিতে এবং দেশবাসীকে বর্ত্তমান সমস্যার গুরুত্ববিষয়ে জাগরূক করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সফলকাম হই, তাহা হইলেই আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি

২৮শে ভাদ্র, ১৩৪১
কলিকাতা

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

সূচীপত্র

বাঙ্গালার হিন্দু

বাঙ্গালার হিন্দু

সে আজ অনেক দিনের কথা, বোধ হয় পঁচিশ বৎসরেরও অধিক হইবে, একদিন বাঙ্গালার পাঠক-সমাজের সমক্ষে একখানা পুস্তিকা আবির্ভূত হইয়াছিল—পুস্তিকাখানির নাম "Dying Race," এবং তাহার রচয়িতা শ্রদ্ধেয় কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। নানাবিধ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন ও আলোড়নের দরুণ আমাদের হিন্দু-বাঙ্গালীদের চিন্তা নানাদিকে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি এমন একটা গুরুতর বিষয়ে এমন সোজাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে উহার মর্ম্ম অনুধাবন করিবার পর সকলেরই একটু থমকিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

ক্ষণেকের জন্য অনেকেরই মনে এই চিন্তা জাগিয়াছিল—তাই ত, এই যে এত বড় জাতি, শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে সভ্যতায় সমুজ্জ্বল, ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ভারতের উন্নততম জাতি, বাঙ্গালার হিন্দু, ইঁহারা সত্যই কি একটা dying race, একটা ধ্বংসোন্মুখ জাতি ? তাহাদের বাহিরের এত যে চাকৃচিক্য, এত যে গরিমা, এত যে আস্ফালন, ইহার পরিণাম কি সমূহ আত্ম-বিলোপ ? জাতির ভিতরে যে অক্ষুণ্ণ প্রাণধারা এত শতাব্দী ধরিয়া নানা বাধাবিপত্তি-সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়াও সতেজে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, আজ কি সত্যই সেই ধারা মরুপথে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে ? এতই কি দুর্ব্বল, নির্ব্বীর্য্য, প্রাণশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে হিন্দু-বাঙ্গালী জাতিহিসাবে ? হিন্দু-বাঙ্গালীর ভিতরে এতই কি ঘুণ ধরিয়াছে যে একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইতে বসিয়াছে তাহারা ? আর সত্য সত্যই যদি সেই প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়া থাকে আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, তবে কিং কর্ত্তব্যম্ ?

এই প্রকার চিন্তা, আলোচনা ও আত্ম-পরীক্ষা কিয়ৎকালের জন্য বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল বেশ মনে পড়ে। তারপর ? তারপর আমাদের হিন্দু-বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতা, নিশ্চিন্ততা, বাস্তবজগতের সহিত অপরিচয় ও তাহাতে অনাস্থা, এবং নানাবিধ স্বকপোলকল্পিত আদর্শের আলেয়ার দিকে ধাবমান হইবার একটা দুর্ব্বার অভ্যাসের ফলে সহজেই ঐ সব অপ্রীতিকর আলোচনার ধারা অচিরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্ আমরা সাম্যবাদ, গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা, ভারত-উদ্ধার প্রভৃতি মনোমদ ব্যাপারেই পুনরায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এবং বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া শিক্ষিত হিন্দু-বাঙ্গালীর ইতিহাস সেই অবাস্তব আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবনেরই ইতিহাস।

কিন্তু নিজে চোখ বুজিয়া থাকিলেই জগৎটা উবিয়া যায় না। বাস্তব জগৎ বড় কঠোর ঠাঁই। তুমি সে কম্বলকে যতই ছাড়িতে চাও

কম্‌লী ছোড়্‌তা নেহি। বাস্তবের ধাক্কা তোমার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া লাগিবেই, তুমি যতই তাহার স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে সরিয়া আলগোছ হইয়া থাকিতে চাও না কেন। হিন্দু-বাঙ্গালীরও হইয়াছে তাহাই। আজ বাঙ্গালা প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ, কাল তাহার পুনর্ব্বিভাগ, পরশু হিন্দুসমাজেরই নিম্নতর শ্রেণীর বিদ্রোহ, তার পরদিন এই বাঙ্গালারই বুকে হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মুসলমানসমাজের প্রাধান্য লাভের দুর্দ্ধর্ষ প্রচেষ্টা—এই রকম একটার পর একটা, ঘটনা-পরম্পরা ধাক্কা দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুকে জোর করিয়া সচেতন করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং হাঁক দিয়া বলিতেছে —যদি বাঁচিতে চাও, তবে এখনও ঘর সামলাও।

কাজেই এই মরণ-বাঁচনের সমস্যাকে কোনপ্রকারে ধামাচাপা দিয়া এড়াইবার চেষ্টা করিলে আর চলিবে না। এই গুরুতর সমস্যার বিষয় ধীরভাবে, গভীরভাবে এবং ঐকান্তিকভাবে আলোচনা করিতে হইবে এবং এই আসন্ন ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণামের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কিনা তাহা তদ্গতভাবে বিচার করিতে হইবে। উপায় যে আছেই, ইহাও হয়ত নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না; কেননা, ব্যাধি থাকিলেই যে তাহার একটা প্রতিকার থাকিবে, একথা আমাদের যতই রুচিকর হউক, কিন্তু বস্তুতঃ সর্ব্বদা সত্য নহে; সত্য যদি হইত তবে মৃত্যু বলিয়া একটা বিভীষিকা আজ পর্য্যন্ত এই জগতে থাকিত না। হয়ত আলোচনার ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে সম্পূর্ণ প্রতিকার ইহার নাই। হয়ত বর্ত্তমানে জাতিহিসাবে বাঙ্গালী হিন্দুর যে দুর্ব্বলতা যে পঙ্গুত্ব আসিয়াছে, তাহা নিরাকরণ সম্ভবপর হইবে না; তবে ভবিষ্যতে যাহাতে আরও ঘোরতর অবনতি ও ধ্বংসপ্রবণতা না হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা হয়ত সম্ভব এবং হয়ত আমাদের সাধ্যাতীত নহে। তাহা হইলেও মন্দের ভাল। প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে; তবে আবার নূতন কর্ম্মফল পুঞ্জীভূত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতের

আশাও সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ করিয়া না দাঁড়ায় অন্ততঃ সেই চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাই আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যাঁহারা চিন্তাশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহাদের আজ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য হইতেছে এই হিন্দুসমাজসমস্যার সমুচিত আলোচনা করা এবং তাহার ফলে যে কর্ম্মপদ্ধতি উচিত বিবেচনা হয় দৃঢ়ভাবে সেই কর্ম্মপন্থাকে অনুসরণ করা। বাস্তবকে অবজ্ঞা করিয়া, আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া, মিথ্যা মায়ামরীচিকার পশ্চাতে সময় ও সামর্থ্য অপচয় করিবার অধিকার আর যাহারই থাকুক, বাঙ্গালী হিন্দুর নাই।

সমস্যাটি বিস্তৃত, গভীর ও বহু প্রাচীন। নানা দিক্ দিয়া ইহার আলোচনা চলিতে পারে। জাতিতত্ত্বের দিক্ দিয়া, ইতিহাসের দিক্ দিয়া, সমাজনীতির দিক্ দিয়া, রাজনীতির দিক্ দিয়া, অর্থনীতির দিক্ দিয়া, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের এই ক্রম-বিবর্দ্ধমান অবনতির আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতে পারে এবং চলা উচিত। এবং বিষয়টি যেরূপ ব্যাপক ও গুরুতর, তাহার উপযুক্ত আলোচনা যে এপর্য্যন্ত আমাদের সমাজে হয় নাই ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। একটি মাত্র প্রবন্ধে অবশ্য বিস্তৃত আলোচনা হওয়া অসম্ভব, শুধু মোটা মোটা কয়েকটা প্রসঙ্গ এস্থলে উল্লেখ করিতে চাই।

প্রথমে ইতিহাস ও জাতিতত্ত্বের দিক্ দিয়াই ধরি—কারণ বাঙ্গালার হিন্দুসমস্যার একেবারে গোড়ার কথাই হইতেছে জাতিসঙ্ঘাতের ব্যাপার। আমরা সকলেই জানি বাঙ্গালার স্থান উত্তর-ভারতে এবং তাহার এক প্রত্যন্ত প্রদেশে এবং অতি সুদূর প্রাচ্যে। আর্য্যদিগের আদি বাসভূমি যেখানেই থাকুক না কেন—মধ্য-এশিয়াতেই হউক, কি সপ্তসিন্ধুতেই হউক, কি ইলাবৃতবর্ষেই হউক—নানা পণ্ডিতের নানা মত—কিন্তু একথা কেহই বলেন না যে বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান ছিল। উত্তর-পশ্চিমের কোন এক সুদূর স্থান হইতে আর্য্য উপনিবেশ ক্রমশঃ প্রাচ্যদিকে প্রসারিত

হইতে লাগিল—প্রথমে কুরুপঞ্চাল, তারপরে কোশল, তারপরে মিথিলা মগধ, তারপরে বঙ্গ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—অনেকটা এই প্রকার। সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশ—অর্থাৎ ভাগীরথী পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের সন্তান যে বাঙ্গালাদেশ, সেই বাঙ্গালাদেশ নানাবিধ অনার্য্যজাতিদিগের আবাসভূমি ছিল, কখনই মনুষ্যবর্জ্জিত ফাঁকা প্রদেশ ছিল না। সেই সব অনার্য্য জাতিসমূহ কোন্ কোন্ বংশোদ্ভব—তাহারা কতটা দ্রাবিড়, কতটা মঙ্গল, কতটা কোল, সে বিষয়ে গবেষণার এস্থলে কোন প্রয়োজন নাই—তবে একথা নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে যে সভ্যতার স্তর হিসাবে বাঙ্গালার আদিম অনার্য্যগণ তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর্য্যদিগের অপেক্ষা নিম্নস্তরে ছিল। এবং যখন ধীরে ধীরে প্রাচ্যদিকে আর্য্যের অভিযান অগ্রসর হইতে লাগিল, তখনও এত দূরে—পঞ্চনদ হইতে বাঙ্গালা মুল্লুকের দূরত্ব ত বড় কম নয়, হাজার মাইলের উপর হইবে—এত দুস্তর নদী-কান্তার-অরণ্য ভেদ করিয়া অতি অল্প দুঃসাহসিক আর্য্য ঔপনিবেশিকই বাঙ্গালায় আসিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই সুদূর বাঙ্গালা সম্বন্ধে আর্য্যমহলে অনেক প্রকার অদ্ভুত কাহিনী কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ"—অর্থাৎ বঙ্গ ও মগধ ইত্যাদির জাতিগুলি পক্ষীর ন্যায়। ইহাই যথেষ্ট উদাহরণ বিবেচিত হইবে। যাহারা অসমসাহসিকতায় নির্ভর করিয়া বাঙ্গালা মুল্লুক অবধি পদার্পণ করিতে পারিত, তাহাদের পুরস্কার হইত জাতিচ্যুতি। এখনও অতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানকে পাণ্ডব-বর্জ্জিত বলা হয়, অর্থাৎ পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় উপলক্ষেও সেই সব স্থানে পদার্পণ করেন নাই, সুতরাং কোন ভদ্র আর্য্যসন্তানের ঐ সব স্থানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। যাহাই হউক, এহেন দুষ্প্রধৃষ্য দুরধিগম্য যে বাঙ্গালা এবং তৎপরবর্ত্তী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ বর্ত্তমান আসাম, এখানেও কালক্রমে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইল। অবশ্য উত্তরভারতে সরস্বতী-দৃষদ্বতীর অথবা গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাতে আর্য্যদিগের

বসতি যেরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল, বাঙ্গালায় স্বভাবতঃই সেরূপ হইতে পারে নাই। কিন্তু এই সুদূর প্রাচ্যে জাতিগত আর্য্যের বসতি বিরল হইলেও আর্য্য সভ্যতা ও cultureএর প্রসার যথেষ্টই হইয়াছিল। নিম্নাঙ্গের সভ্যতার সহিত উচ্চাঙ্গের সভ্যতার সঙ্ঘাতে সর্ব্বত্রই যেরূপ ঘটিয়া থাকে, এস্থলেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই—অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্য বিজেতাদিগের জাতিগত মিশ্রণ খুব বেশী হয়ত না হইয়া থাকিলেও অনার্য্যগণ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আর্য্য-সভ্যতার আওতার ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ধীরে ধীরে তাহারা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াও কতক কতক নিজস্ব আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ব্যবসায় এইসব নিম্নস্তরের অনার্য্যগণ সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু মোটামুটিভাবে তাহারা সুবিশাল হিন্দুসমাজের উচ্চতর সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুসমাজে শুদ্ধি প্রথা আজ নূতন করিয়া fashionable হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সুদূর অতীতে প্রথম আর্য্যবিজয় ও অভিযানের সময়ে অতি ব্যাপকভাবেই হিন্দুসমাজের ভিতরে অনার্য্যদিগের এই শুদ্ধি অথবা absorption হইয়াছিল। ইহা বর্ত্তমান ভারতীয় জাতিতত্ত্বের একটা মোটা কথা। তবে এইসব অন্তর্ভুক্ত বিজিত অনার্য্যগণ সমাজের নিম্নস্তরেই স্থান পাইয়াছিল এবং প্রাচীন আর্য্যসমাজের চতুর্থপাদ শূদ্রজাতির সংখ্যাই বৃদ্ধি করিয়াছিল। কোথাও বা তাহারা এই চতুর্থেরও অতিরিক্ত এক পঞ্চম বা অন্ত্যজ জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের চতুর্থ শূদ্র অথবা পঞ্চম অন্ত্যজ জাতিসমূহের উদ্ভবের ইতিহাস মোটামুটি ইহাই।

এখন বাঙ্গালার সঙ্গে উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শূদ্র-অন্ত্যজ সমস্যার প্রভেদ এই যে উত্তর ভারতের অন্যত্র আর্য্যবসতি ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়াতে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত অনার্য্যজাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু বাঙ্গালা ও আসামে আর্য্যগণ বিরলবসতি হওয়াতে অনার্য্যগণ নামতঃ

হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইলেও অত্যন্ত সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ছিল। এই তারতম্যের ফল এই বিশ ত্রিশ শতাব্দী পরেও অনুভূত হইতেছে; এখনও উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তথাকথিত Depressed Classes অথবা নিম্ন শূদ্র বা অন্ত্যজ জাতির সংখ্যা অনেক কম; কিন্তু আমাদের এই বাঙ্গালা-আসাম মুল্লুকে ঐ শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী; এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে স্থান যত বেশী পূর্ব্বে বা প্রান্তদেশে বা দুর্গমদেশে ততই তথায় ইহাদের অনুপাত বেশী। দক্ষিণভারতের অবস্থা অন্য প্রকার; কারণ সেখানে আর্য্য-সভ্যতারই বিস্তার হইয়াছিল, আর্য্যজাতির উপনিবেশের বিস্তার তেমন হয় নাই। সেখানে দ্রাবিড়গণের প্রবল সভ্যতা যখন আর্য্যভাবানুপ্রাণিত হইল, তখন দ্রাবিড়গণের মধ্যেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উদ্ভব হইল। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ঠিক আর্য্যরক্ত কতটা মিশ্রিত আছে, কিংবা আদৌ আছে কিনা, খুবই সন্দেহের বিষয়। অবশ্য দ্রাবিড়গণের মধ্যেও পঞ্চম বা অন্ত্যজ শ্রেণীর কোন অভাব নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে অস্পৃশ্যতার বাড়াবাড়ি দাক্ষিণাত্যেই বেশী—সম্ভবতঃ দ্রাবিড়গণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের যে সমস্ত tribes অথবা জাতি ছিল, অথবা নিকৃষ্ট ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাতে ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তাহারাই পঞ্চম শ্রেণীতে স্থান লাভ করিয়াছে।

যাহা হউক বাঙ্গালাতে অবস্থা দাঁড়াইল এইরূপ—দ্বিজাতি আর্য্যেরা রহিলেন সমাজপতিরূপে, সমাজের পাণ্ডা উপদেশক পুরোহিত উচ্চশ্রেণী ইত্যাদিরূপে, এবং হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত অনার্য্যের বিবিধ শাখা রহিলেন বিশাল শূদ্র বা অন্ত্যজ জাতিরূপে। ঠিক রক্তের মিশ্রণ কোথাও বা হইয়াছে কোথাও বা হয় নাই, কিন্তু তাহাই বাঙ্গালার জাতিতত্ত্বের প্রধান কথা নহে। আবার, হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অঙ্গীভূত অনার্য্যদিগের বিবিধ শাখা যে সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই একেবারে অপরিবর্ত্তিত বা stereotyped হইয়া রহিয়াছে, তাহাও নহে। পরবর্ত্তী কালে উত্তর-পূর্ব্ব

প্রত্যন্তসীমার বাহির হইতে নানাবিধ নূতন নূতন অনার্য্য জাতি—কোচ, আহোম, রাজবংশী, ইত্যাদি কত জাতি—কতক হয়ত কোল বংশীয়, কতক মঙ্গল বংশীয়, কতক হয়ত অনির্দ্দিষ্ট বংশীয়—বাঙ্গালা ও আসামের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং কালক্রমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়া নিজ নিজ গুণ ও ব্যবসায়োচিত স্থান পাইয়া শূদ্র সমাজের দল বৃদ্ধি করিয়াছে। এই process অথবা পদ্ধতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে, লোকের একরকম অলক্ষ্যে, এবং বিনা চেষ্টায়, শুধু অবস্থার চাপে এখনও চলিতেছে; unconscious ভাবে এই যে প্রণালী চিরকাল ধরিয়া হিন্দু-সমাজের বল বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে, আজকালকার নব্য-তন্ত্রের শুদ্ধি-সংগঠন শুধু তাহারই self-conscious সংস্করণ বই আর কিছুই নহে। মোটামুটিভাবে হিন্দুসমাজসংখ্যার বিবর্ত্তনের ইতিহাস ও প্রণালী ইহাই।

সমাজ-শরীরের গঠন এইপ্রকার হইয়া দাঁড়াইবার পরে ইহার উপর বহুবিধ বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। অনার্য্যসংখ্যাই সমাজের মধ্যে বেশী পরিমাণে থাকায় আর্য্য শিষ্টাচারের বিশুদ্ধি অনেকস্থলেই তেমনভাবে বাঙ্গালায় রক্ষিত হয় নাই; তাছাড়া উত্তর ভারতে আর্য্যসমাজের ভিতর হইতেই নানাপ্রকার ধর্ম্মবিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়াছে—বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও আচারের প্লাবন তন্মধ্যে প্রধানতম। তারপর সেই বৌদ্ধাচারেরও দেশপ্রদেশভেদে কতপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও আচারের সহিত পৌরাণিক নব অভ্যুদিত হিন্দু ধর্ম্ম ও আচারের এবং সম্ভবতঃ কতকটা প্রাচীন অনার্য্য ধর্ম্ম ও আচারের সংমিশ্রণ হইয়া বাঙ্গালায় ও উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও আচারের উদ্ভব হইয়াছে। এই ধর্ম্ম, আচার ও সমাজ-বিশৃঙ্খলা এত সুদূরব্যাপী হইয়াছিল যে প্রবাদ আছে যে আচারনিষ্ঠ স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ পাওয়াই বঙ্গদেশে দুর্ঘট হওয়ায় সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সদ্ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া বাঙ্গালাতে বসাইয়াছিলেন, এবং তারও কিছুকাল পরে

মহারাজ বল্লাল সেন নিষ্ঠাবান্ আর্য্যদিগকে আরও সম্মানিত করিবার জন্য কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক আচার পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই সমস্ত ধর্ম্মবিপ্লবের গুরুত্ব যতই হউক, জাতিতত্ত্বের দিক্ হইতে গুরুত্ব তেমন বেশী নয়। কারণ ইহাতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের essential structure বা আদত গঠনভঙ্গিমার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই—হয়ত মাত্র রক্তসংমিশ্রণ কিছু বেশী ঘটিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উচ্চস্তর মাত্র প্রধানতঃ আর্য্য এবং বিশাল নিম্নস্তর প্রধানতঃ অনার্য্যমূলকই রহিয়া গেল। যদি বাহির হইতে আর একটা প্রবল যুধ্যমান সভ্যতা ভারতের এবং বঙ্গদেশের উপরে আসিয়া আপতিত না হইত, তাহা হইলে হয়ত কালধর্ম্মে বর্ত্তমান সাম্যবাদ ও secularism এর সংস্পর্শে এই মূলতঃ আর্য্য-অনার্য্য প্রধান যে দ্বিজাতি শূদ্রজাতির দ্বন্দ্ব ও বিভেদ, তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়া একটা অখণ্ড সবল দৃঢ় হিন্দুজাতি গড়িয়া উঠিতে পারিত এবং আর্য্যসভ্যতানুপ্রাণিত ভারতবর্ষ বাস্তবিকই হিন্দুস্থানে পরিণত হইতে পারিত।

কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবিপর্য্যয়ে বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম-এশিয়ার সেই সুদূর আরব মরুভূমির এক কোণে এক যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জন্ম হইল। সেই মহাপুরুষের ধর্ম্মোন্মাদতরঙ্গ দেখিতে দেখিতে সমস্ত আরব ভূমিকে প্লাবিত করিল—বিচ্ছিন্ন বিবদমান আরব বেদুইনদের বিবিধ জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিল—সমস্ত সংহত আরবজাতি সেই ধর্ম্মপ্লাবনের মহাবন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল—আরবসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই তরঙ্গের অভিঘাত দিকে দিকে দেশে দেশে প্রসৃত হইতে লাগিল—প্রাচীন রাজ্য সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল—মিশর ভাসিয়া গেল—সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ভাসিয়া গেল, তরঙ্গ আটলাণ্টিক মহাসাগরের কূল প্লাবিত করিল, তারপর উত্তরে চলিল ইউরোপে—স্পেন ভাসিয়া গেল, ফ্রান্সের অর্দ্ধেক ভাসিয়া গেল—এক

সময়ে মনে হইল গোটা ইউরোপই বুঝিবা ভাসিয়া যায়—আর এদিকে প্রাচ্য ভূখণ্ডে সিরিয়া বিধ্বস্ত হইল, পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়িল, সুদূর ভারতের সিন্ধুতটে ইস্‌লামের ঢেউ আছড়াইয়া পড়িল—তথায় ক্ষণতরে প্রতিহত হইয়া ঢেউ আবার উত্তরে ফিরিল—আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী গ্রীকো-বাক্‌ট্রিয়ানদিগের হেলেনীয় সভ্যতার লীলাভূমি, প্রাচীন বৌদ্ধ-সম্রাট কনিষ্কের বিহার-নিকেতন গান্ধার, সুবাস্তু, মধ্য-এশিয়ার অধিত্যকা, সমস্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিল—আবার পশ্চাতের আর এক উত্তালতরঙ্গ ভীমবেগে আসিয়া আর্য ঋষি-অধ্যুষিত সপ্তসিন্ধু ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত ভাসাইয়া লইয়া চলিল—সেই তরঙ্গের অভিযান শেষ হইল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সমতটে শ্যামল-প্রান্তর-প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই যে ইসলামের বিশ্বগ্রাসী প্রলয় প্লাবন—ইহার তুলনা বোধ হয় আর ইতিহাসে দুইটি নাই—অথবা হয়ত ইহার একমাত্র তুলনা চলিতে পারে সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শ্বেতজাতির দিগ্বিজয়ের সঙ্গে।

সে যাহাই হউক আমরা বাঙ্গালার কথা বলিতেছিলাম। এই বাঙ্গালার সমাজ-শরীরের উপর এই প্লাবন অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে এবং যতই কাল অতীত হইতেছে ততই এই ক্ষতচিহ্ন গভীরতর হইয়া উঠিতেছে —হয়ত বা ভবিষ্যতে সমস্ত হিন্দুসমাজ-শরীরকেই বিধ্বস্ত করিয়া ইস্‌লামের কুক্ষিগত করিবে ইহাও একেবারে বিচিত্র নহে। এই অভিঘাতের ফলাফল পর্য্যালোচনা করা যাউক।

মুসলমানের আক্রমণ ও রাজ্যস্থাপন ভারতে কিংবা বাঙ্গালাতে হিন্দুসমাজের উপর প্রথমেই যে বিশেষ আঘাত করিতে পারিয়াছিল তাহা নহে। প্রথম শুধু জেতা-জিত ভাব—রাজনৈতিক প্রভুত্ব। সেই প্রভুত্ব যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে অনেকটা কায়েমীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিল, তখন হইতে ধীরে ধীরে উত্তরভারতের হিন্দুসমাজের উপর

প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। একেবারে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ যমুনা উপত্যকা হইতে সিন্ধু উপত্যকা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি আজকালকার পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধু প্রদেশ, ইহাতে বিদেশাগত মুসলমানগণ অনেকটা বসবাসই করিতে লাগিলেন। কিন্তু তদপেক্ষা প্রাচ্যভাগে অর্থাৎ গঙ্গা উপত্যকাতে শুধু রাজত্বই করিলেন—তেমন বেশী উপনিবেশ হইল না, বাঙ্গালাতে ত আরও কম। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্য বাঙ্গালাতে কিছুমাত্র কম ছিল না—এবং তাহা সারা বাঙ্গালাতেই ছিল—কোন সময়ে গৌড়ে রাজধানী ছিল, কোন সময়ে বা সোণারগাঁয়ে, কোন সময়ে বা মুর্শিদাবাদে—মোটকথা, রাজনৈতিক প্রভুত্ব হিসাবে কি পশ্চিম কি পূর্ব্ব কি উত্তর বাঙ্গালা কোনটাতেই মুসলমান প্রভাব কিছুমাত্র কম ছিল না। তবে হিন্দুরা যে একেবারে নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাও নহে—হিন্দু জমিদার ও সামন্তরাজগণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় স্বাধীন ছিলেন বলিলেই হয়—তবে নবাব সরকারে খাজনা দিতে হইত এবং তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। যে সমস্ত মুসলমান নরপতি বাঙ্গালা শাসন করিতেন তাঁহারাও তদ্রূপ প্রায় স্বাধীন ছিলেন বলিলেই হয়, তাঁহারাও দিল্লীর বাদশাহকে শুধু খাজনা দিতেন এবং বশ্যতা স্বীকার করিতেন মাত্র। অনেক সময়ে তাহাও করিতেন না, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। মোগল সম্রাট্ আকবরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় এই প্রকারেই চলিয়াছিল। এবং স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই যে সভ্যতার স্ফুরণের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নৃপতিগণের শাসনকাল বাঙ্গালার কম গৌরবময় যুগ নহে। হিন্দুমুসলমান সভ্যতার সঙ্ঘর্ষের ফলে বাঙ্গালার বুকে যে বিচিত্র প্রেরণা, যে অদ্ভুত প্রতিভা, যে আশ্চর্য্য ঔদার্য্য দেখা দিয়াছিল, যাহা প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের প্রেমবন্যায়, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মনীষায়, নৈয়ায়িক রঘুমণির

তীক্ষ্ণধীতে, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের পাণ্ডিত্যে মূর্ত্ত হইয়াছিল—তাহা এই বাঙ্গালার স্বাধীন আফগান নৃপতি হুসেন সাহের যুগেই। তখনও রাজনৈতিক প্রভুত্বে মুসলমান প্রধান হইলেও হিন্দুসমাজ-শরীর বিশেষ বিধ্বস্ত হয় নাই, কারণ সংখ্যাহিসাবে মুসলমান মুষ্টিমেয় ছিল। অবশ্য মুসলমান cultureএর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলিলে বলিতে হয় যে সম্রাট্ আকবরের সময় হইতেই বাঙ্গালায় হিন্দুর স্বাধীন প্রতিভা স্ফুরণের পথে ক্রমশঃ বাধা জন্মিতে লাগিল। আকবর বাদশাহের পর হইতেই ঠিক বাঙ্গালা রীতিমত পরাধীন হইয়া চলিল, এবং বাঙ্গালার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রকৃতির যে সোণার ধনধান্য, তাহা বাঙ্গালা হইতে অপসৃত হইয়া আগ্রা-দিল্লীর বিলাসহর্ম্ম্যের মশলা যোগাইতে লাগিল। এই যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, ময়ূরসিংহাসন, মতি মস্‌জীদ, এসব ত বাঙ্গালারই বুকছেঁচা ধনে নির্ম্মিত। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ঈষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সময়ে যেমন ভারতের ঐশ্বর্য্যে ইংলণ্ড ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং ধনে সম্পদে বাণিজ্যে পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের ঐশ্বর্য্যলীলা বাঙ্গালার সুবা তাঁহাদের সম্পূর্ণ করতলগত ছিল বলিয়াই সম্ভব হইয়াছিল। প্রাক্-মোগল যুগে এতটা শোষণ হয় নাই, কারণ তখন বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য প্রধানতঃ বাঙ্গালাতেই ব্যয়িত ও নিঃশেষিত হইত। ইহা ত গেল অর্থনীতির দিক্ দিয়া মোগলসাম্রাজ্যের ফল বাঙ্গালা দেশে। রাজনৈতিক দিক্ দিয়াও ফল অনেকটা তদ্রূপ। মোগলদের সাম্রাজ্য অনেক বেশী সুসংহত সুদৃঢ় সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল—উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত এতটা না হইলেও পাঠানদের আমল অপেক্ষা অনেক বেশী সুগঠিত ছিল। তাছাড়া মগ ও পর্টুগীজ জলদস্যু-দিগের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ঢাকাতে এক রাজধানী নির্ম্মিত হইল, আওরঙ্গজেবের সময়ে সুদূর আরাকানরাজকে পরাজিত

করিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অধিকৃত হইল, মীরজুমলা আসাম জয় করিতে গেলেন—বলিতে গেলে প্রাচ্য সীমান্তে, ব্রহ্মদেশ বাদ দিলে, মোগল সাম্রাজ্য প্রায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পর্য্যন্তই পৌঁছিয়াছিল। এইভাবে প্রবল মুসলমান রাজশক্তি সুদৃঢ়ভাবে সমস্ত বাঙ্গালার উপরে জুড়িয়া বসিল। বারভূঞাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী, চাঁদ রায় কেদার রায়ের সমর-নৈপুণ্য, প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্য ও রণ-কৌশল শুধু ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া রহিল। স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা স্ফুরণের ফুরসুত হিন্দুর পক্ষে আর বড় একটা রহিল না।

এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রভুত্ব এতদিনে হিন্দুর সমাজ-শরীরে বেশ একটু আঘাত করিল। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে হিন্দুসমাজের উচ্চস্তর বাদ দিলে প্রায় গোটা শরীরটাই শূদ্র অথবা অনার্য্যমূলক। উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনার্য্যপ্রভাব এত বেশী নয়, সেখানে আর্য্যপ্রভাবই বেশী। তাই সেই সব স্থানে অর্থাৎ গঙ্গা-উপত্যকায় অর্থাৎ বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে Depressed Class গুলির সংখ্যা তত বেশী নহে এবং সেই নিম্নশ্রেণী হইতে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা আরও কম। সেই সব স্থানের যে সব মুসলমান তাহারা অধিকাংশই আফগান, তুরস্ক ইত্যাদিজাতীয় আগন্তুক ঔপনিবেশিক মুসলমানদের বংশধর। কিন্তু বাঙ্গালায়—বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও উত্তর বাঙ্গালায়, অর্থাৎ যেখানে অনার্য্যমূলক শূদ্রজাতির সংখ্যা খুবই বেশী ছিল—তথায় মুসলমান প্রভুত্বের ফল হইল অন্যরূপ। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইস্লাম democratic ধর্ম্ম। ইহার আচারাদি বহুলরূপে সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মান্তরিত হইবার পর হইতে পরকে ইহা একান্ত আপনার করিয়া লয়, হিন্দু তাহা করে না—এমনকি খৃষ্টানও এতটা করে না। সুতরাং একে রাজনৈতিক প্রভুত্বের moral effect, তার উপরে ইস্লামের সাম্যবাদ, এবং হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরের ঘৃণামূলক ব্যবহার, এই সমস্তের

ফলে অনার্য্যমূলক হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণী বহুসংখ্যায় মুসলমান হইতে লাগিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ভাঙ্গন চলিতে থাকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন শাসনদণ্ড মুসলমানের হাত হইতে বাঙ্গালা দেশে ইংরাজের করায়ত্ত হইল, ততদিনে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর বেশ একটা বড় অংশ হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুসলমান হইয়া পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এই স্রোতকে কথঞ্চিৎ বাধা দিয়া থাকিলেও তেমন বেশী কিছু প্রশমিত করিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গেই এই প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হইল—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ দুই অংশেই অনার্য্য element বেশী ছিল, তাই তাহা অপেক্ষাকৃত সহজেই হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য সভ্যতার কুক্ষিগত হইয়া পড়িতে লাগিল। আজকাল খৃষ্টীয় শাসনেও কিয়ৎপরিমাণে এই ভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন না—তথাপি শাসকজাতির ধর্ম্মের prestige এবং বে-সরকারী খৃষ্টান পাদ্রী প্রচারকদিগের চেষ্টাতেই নানাস্থানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। তবে তাহাদের সংখ্যা এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী হইয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু মুসলমানদিগের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজত্ব অপেক্ষা অনেক বেশীদিন স্থায়ী ছিল—প্রায় পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর। তদুপরি ইস্লাম ঘোরতর proselytizing ধর্ম্ম, সুতরাং মোটের উপর বাঙ্গালা দেশে অনেক বেশীসংখ্যক হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে হিন্দু হইতে ধর্ম্মান্তরিত নয়, পরন্তু খাঁটি আফগান কিংবা তুর্কীর বংশধর মুসলমান, দুই চারিটি অভিজাত পরিবারে ভিন্ন বেশী নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবস্থা দাঁড়াইল এইরূপ। ততদিনে ব্রিটিশ শাসন প্রায় সমস্ত ভারতে—মধ্য-ভারতের কোন কোন স্থল ও পঞ্চনদ ব্যতীত—সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালাতে ততদিনে প্রায়

অর্দ্ধশতাব্দী ব্রিটিশ শাসন চলিয়াছে। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ তখনও খুবই প্রবল। নিম্নস্তরের বহুলোক পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে মুসলমান হইয়া গিয়াছে সত্য, তথাপি অধিকাংশ অধিবাসী তখনও হিন্দুই রহিয়াছে; পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গেও তখন পর্য্যন্ত হিন্দুই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গের ত কথাই নাই। তদুপরি, সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি শুধু ত নিম্নশ্রেণীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা বিচক্ষণতার উপরই বেশী নির্ভর করে; এবং বাঙ্গালাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দুর উচ্চশ্রেণী এই সব বিষয়েই অগ্রণী ছিল। তাহার কতকগুলি বড় বড় কারণও ছিল। প্রথম কারণ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা, যাহার বলে মুসলমান আধিপত্যের সময়েও জমিদারীর কাজে, রাজকীয় দপ্তরখানায়, খাজাঞ্চী খানায়, দেওয়ানী কার্য্যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণেরই প্রাধান্য ছিল। দ্বিতীয় কারণ, আদালতের ভাষা পার্শী-উর্দ্দু হইতে ইংরাজীতে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে প্রাচীনপ্রথায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ মুসলমানগণও অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। এবং তৃতীয় কারণ, বোধ হয় প্রায় এক শতাব্দীকাল, অভিমানবশেই হউক অথবা ঘৃণাবশেই হউক, মুসলমানগণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত বিরাগের ভাব প্রবল ছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগ কাহারও জন্য ত অপেক্ষা করে না, কাজেই সুশিক্ষিত উচ্চশ্রেণীস্থ মুসলমানগণও পিছনে পড়িয়া রহিলেন, নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুসমাজ হইতে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানগণের ত কথাই নাই। তাই সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কি রাজনীতিতে, কি সমাজসংস্কারে, কি বিদ্যায়, কি বাণিজ্যে, কি ব্যবসায়ে, সর্ব্বত্র হিন্দুরই প্রাধান্য দেখিতে পাই, মুসলমানের উল্লেখযোগ্য নাম দুটি একটির বেশী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বাঙ্গালার বাহিরেও ইংরাজ রাজত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বাঙ্গালী হিন্দুরও প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশ প্রসারিত হইতে লাগিল।

তাহার প্রধান কারণ, ইংরাজী শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙ্গালায়, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম উন্মেষ হয় বাঙ্গালায়, ভারতের রাজধানী ছিল বাঙ্গালায়, পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় শিক্ষক রাষ্ট্রনীতিবিদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল বাঙ্গালী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের সঙ্ঘাতে যে নবীন জীবন স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সেই নবজীবনের প্রথম উদ্ভাসিত উজ্জ্বল বিকাশ তাই এই বাঙ্গালারই বক্ষে। তাই রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ, বিবেকানন্দ, মাইকেল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, আরও কত কত মনীষীর নাম উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। হুসেনসাহী যুগে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যেরূপ হিন্দুমুসলমান সভ্যতার সঙ্ঘাতে বাঙ্গালা একটা নূতন প্রেরণা অনুভব করিয়াছিল—ধর্ম্মে, জ্ঞানে, কাব্যে, সঙ্গীতে—ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘাতে বাঙ্গালা তদপেক্ষাও প্রবলতর পূর্ণতর প্রেরণা অনুভব করিয়াছিল। তাই জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রত্যেক দিকে বঙ্গীয় হিন্দুপ্রতিভার অতুলনীয় স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গীয় হিন্দুর উন্নতির স্রোতে ভাঁটা দেখা দিয়াছে। তাহারও কারণ আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালীর যে একটা শ্রেষ্ঠত্ব দেখা গিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে, তাহা অনেকটা আকস্মিক বা accidental। সে accident হইতেছে বাঙ্গালাতেই প্রথমে ইংরাজের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা, কলিকাতাতে রাজধানী স্থাপন এবং ইংরাজীশিক্ষার প্রথম পত্তন বাঙ্গালা দেশে হওয়া। কালক্রমে সমস্ত ভারতই ইংরাজের করায়ত্ত হইল, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার সর্ব্বত্রই হইতে লাগিল, কাজেই বাঙ্গালীর যে accidental advantage টুকু ছিল, তাহা আর বেশী দিন রহিল না। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতেই অর্থাৎ লর্ড ড্যালহৌসীর শিক্ষাসংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্ত

ভারতময় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই, অন্য প্রদেশস্থ লোকেরা আবার প্রায় বাঙ্গালীর সমান সমান হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল ; কারণ সেই সব স্থানের অধিবাসিগণ ত জাত্যংশে এবং বুদ্ধিতে বাঙ্গালী অপেক্ষা বিশেষ কিছু খাটো নহে ; শুধু সুবিধা-সুযোগ না পাওয়াতে তাহারা বাঙ্গালীদের পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। তাই বাঙ্গালীর সহিত অবাঙ্গালীর তুলনা করিতে গেলে দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই অবাঙ্গালীর উন্নতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভেই কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়াতে বাঙ্গালীর শেষ যেটুকু সুবিধা ছিল, তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল। এখন বাঙ্গালা আর সদর নয়, নেহাৎ মফঃস্বল। এবং সদর ও মফঃস্বলের ভিতর যেটুকু moral এবং intellectual তফাৎ, বাঙ্গালা এবং উত্তর-ভারতের সঙ্গে এখন অনেকটা সেই তফাৎ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাই রাজধানী পরিবর্ত্তনের পর এই বিশ বৎসরে বাঙ্গালা আরও অনেকখানি পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে। এই যে অবনতি কিংবা পশ্চাদ্গতি, ইহা অবশ্য সব বাঙ্গালীর পক্ষেই সমান—কি হিন্দু, কি মুসলমান। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার বাঙ্গালার হিন্দুরই পশ্চাদ্গতি কিছু বেশী হইয়াছে। তাহার কারণ স্বতন্ত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেও মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা কম ছিল। পশ্চিম বঙ্গে ত কম ছিলই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস পর্য্যন্তও প্রায় সেই রকম অবস্থা। ইহার পর হইতেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের স্বাস্থ্য ক্রমেই মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। দ্রুতবেগে নানাস্থানে রেল লাইন প্রসারের দরুণই হউক, অথবা অন্য কোন কারণে বাঙ্গালার নদীনালার স্বাভাবিক গতি মন্দীভূত হইয়া বহুস্থানে জলনিষ্কাসনের পথগুলি শুষ্কপ্রায় হইয়া যাওয়াতেই হউক, পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে ক্রমেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং জেলার পর জেলা একেবারে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। আজও মহামারীর প্রবলতা রাঢ় দেশে কিছুমাত্র কমে নাই। পরন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট। বিশালকায় পদ্মা, মেঘনা এবং তাহাদের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা থাকাতে এবং তাহাদের গতিও মোটের উপর অব্যাহত থাকাতে, drainage বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের আজ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবিতে হয় নাই। তবে বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে এই বৎসর দশ বার কচুরিপানার উৎপাতে ছোট ছোট নদী নালা কতকটা রুদ্ধপ্রায় হওয়াতে অনেক স্থলে ম্যালেরিয়ার সঞ্চার হইতেছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্ব বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ভাল, উত্তর বাঙ্গালারও নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গালার বর্দ্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ এই মহামারীর প্রকোপে একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে—গ্রামগুলি লোকপরিত্যক্ত হইয়া সত্যই deserted villageএ পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিস্তৃত সৌধমালা পশ্চিম বঙ্গের পল্লীতে অনেকস্থলেই শৃগাল-কুক্কুর-সর্পাদির আবাসস্থল হইয়া বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। বাঙ্গালাদেশের দুই অংশের স্বাস্থ্য বিষয়ে এই যে তারতম্য, ইহা বঙ্গীয় সমাজশরীরে সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করিয়াছে। কারণ পশ্চিম বাঙ্গালাই প্রধানতঃ হিন্দু বাঙ্গালা, পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল ধরিয়া এই স্বাস্থ্য-হানির ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অতি কমই হইয়াছে, পরন্তু পূর্ব্ববঙ্গের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই শুধু এই কারণেই—অন্য কারণ বাদ দিলেও—মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত ক্রমশঃই বাঙ্গালাদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং ভবিষ্যতেও পাইবে। আর পূর্ব্ববঙ্গে শুধু যে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নহে, স্বাস্থ্যসম্পদ্ উপভোগ করে বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী, কি হিন্দু কি মুসলমান, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত রাঢ়ের বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন, কর্ম্মপটু ও কষ্টসহিষ্ণু।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গেও হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির হার অধিক। তাহার কারণ বোধ হয় কতক পরিমাণে পারিবারিক ও সামাজিক। মুসলমানগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোন restriction বা সংযম নাই বলিলেই চলে; বহুবিবাহ রহিয়াছে, বিধবাবিবাহ রহিয়াছে, সমাজ-বন্ধনের কড়াকড়ি খুবই কম, যৌনবিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাও যথেষ্ট রহিয়াছে —হিন্দুদিগের corresponding যে সব নিম্নশ্রেণী আছে তাহাদের মধ্যেও বিবাহাদি বিষয়ে এতটা স্বাধীনতা বা শাসনশৈথিল্য নাই। ইহা একটা মস্ত কারণ। আর একটা কারণেও মুসলমান সমাজে বংশবৃদ্ধির হার বেশী। মুসলমানগণ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমানগণ, খুব adventurous —নদীতে সমুদ্রে যাতায়াতে কিছুমাত্র ভয় করে না—মাঝি মাল্লা খালাসী সারেং ত অধিকাংশই মুসলমান। পদ্মা মেঘনার মাঝখানেই হউক, অথবা হাতিয়া সন্দীপ বা সুন্দরবনে বঙ্গোপসাগরের কূলেই হউক, যেখানেই নূতন নূতন চড়ার উৎপত্তি হয়, তাহাতে গিয়া চাষ আবাদ করিতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরাই উৎসাহী ও অগ্রণী। তাহারা পৈত্রিক ভিটা আঁকড়াইয়া থাকিয়া মরিবার জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নয়। পরন্তু হিন্দুর নিম্নশ্রেণীর উপরেও পৈত্রিকভিটার মোহ অতি অসাধারণ। নেহাৎ অনাহারে মরিবার উপক্রম না হইলে ভিটা ছাড়িয়া সে কোনমতেই নড়িবে না। আর যদিও বা নেহাৎ পেটের দায়ে একটু নড়ে, আবার কিছু অন্নের সংস্থান হইলেই সেই পুরাতন পৈত্রিক ভিটাতে ফিরিয়া আসিয়া কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কাল কাটাইতে সুরু করিবে। পুরাতন ভিটার এই যে সর্ব্বনাশকর মোহ, ইহা মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম; তাই তাহারা নিত্য নূতন নূতন স্থানে, নূতন নূতন আবাদী ভূমিতে, নূতন নূতন উর্ব্বর চড়াতে গিয়া বসবাস করিতে থাকে, তথায়ই নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া সুস্থদেহে স্বচ্ছন্দচিত্তে উদরপূর্ত্তি করতঃ পূর্ণোদ্যমে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। সমাজ-বিজ্ঞানের ইহা একটা পরীক্ষিত সত্য যে নূতন নূতন virgin landএ যাহারা

উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহাদের মধ্যে বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত অধিক। এই সমস্ত সামাজিক ও নৈসর্গিক কারণে পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলমানগণের সংখ্যাবৃদ্ধির হার অত্যধিক। অর্দ্ধশতাব্দারও উপর ধরিয়া যদি এই সমস্ত কারণের প্রয়োগ ঘটিতে থাকে, তবে তাহার যে ফল হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। হিন্দুগণও যে বাড়ে নাই তাহা নহে, তবে কম বাড়িয়াছে, এবং নিম্নস্তরের লোকই হিন্দুদিগের মধ্যে বেশী বাড়িয়াছে, উচ্চস্তরের ততটা নয়। পশ্চিম বঙ্গে ত খুবই কম বাড়িয়াছে ; এমনকি অনেক জেলা আছে যেখানে গত বিশ বৎসরের মধ্যে লোক বাড়ে ত নাই-ই, পরন্তু কমিয়াছে। তাই আজিকার দিনে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে স্বাস্থ্যহীন বাঙ্গালা প্রধানতঃ হিন্দু এবং স্বাস্থ্যবান্ বাঙ্গালা প্রধানতঃ মুসলমান। সুতরাং প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তরই সেন্সাস হইতে দেখা যায় যে মুসলমানগণের সংখ্যার অনুপাত বাড়িয়া চলিয়াছে। হিন্দু-বাঙ্গালীর সমক্ষে ইহা এক মহাসমস্যা—একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা।

ইহা ত গেল শুধু সংখ্যার দিক্ দিয়া। অন্য দিক্ দিয়াও হিন্দু বাঙ্গালীর তুলনায় মুসলমান-বাঙ্গালীর উন্নতি দ্রুততর হইয়াছে এই বিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত মুসলমানগণের যে শিক্ষা-বিমুখতা ছিল, তাহা ঘটনার নিষ্পেষণে দূরীভূত হইয়াছে—তাহারাও ইংরাজী শিক্ষার দিকে গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা দুই ভাগ হইল এবং ঢাকাকে রাজধানী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হইল তখন মুসলমানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আরও impetus প্রদত্ত হইল। তারপর গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরার সমাবেশে বাঙ্গালী হিন্দু ক্রমেই পিছাইতে লাগিল এবং বাঙ্গালী মুসলমান ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন হইতে আজিকার আইন-অমান্য আন্দোলন পর্য্যন্ত বরাবর হিন্দুরাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুধ্যমান থাকাতে স্বভাবতঃই ইংরাজ

মুসলমানের দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল—তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, তাহাদের সুখ-সুবিধা, রাজসরকারে তাহাদের চাকুরী-বাকুরী যাহাতে বেশী পরিমাণে হয়, সেই দিকেই রাজশক্তি দৃষ্টি দিতে লাগিল। স্বরাজ-আন্দোলন-মত্ত হিন্দুগণ তাহাতে বিশেষ বাধা ত দিতে চেষ্টা করিলই না, বরঞ্চ রাজশক্তির সহিত সংগ্রামে মুসলমানের সাহায্য লাভ করিবার আশায় তাহারা নিজে হইতেই আজ এই pact কাল ঐ pact ইত্যাদি দ্বারা আপনাদের ভবিষ্যৎ mortgage করিয়া মুসলমানগণেরই position সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে লাগিল।

অবশ্য বঙ্গীয় মুসলমানগণের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু হইতে ধর্ম্মান্তরিত বলিয়া বংশগত উৎকর্ষ ও সহজ প্রতিভা এখনও বেশীমাত্রায় লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু এই যে অভাব অথবা handicap ইহাও ক্রমশঃ দূর হইতেছে—বিশেষতঃ রাজনৈতিক কারণে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার পুনর্ব্বিভাগের পর হইতে বিহার-উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল—বহু খাঁটি বঙ্গ-ভাষাভাষী বাঙ্গালীও বাঙ্গালা হইতে বিচ্যুত হইল—পূর্ব্ববঙ্গ পুনরায় রাঢ়ের সহিত যুক্ত হইল, এবং যে নবগঠিত বঙ্গের সৃষ্টি হইল, তাহাতে মুসলমানের সংখ্যারই প্রাধান্য। বিগত বিশবৎসরে সেই সংখ্যাভূয়িষ্ঠতা আরও বাড়িয়াছে। আজ মোটামুটি পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে পৌনে তিন কোটি মুসলমান এবং সওয়া দুইকোটি হিন্দু। তাছাড়া, শাসনযন্ত্রও ক্রমে নানা শাসন-সংস্কারের ফলে গণতন্ত্রমূলক হইয়া পড়িতেছে ও ভবিষ্যতে আরও পড়িবে, এবং গণতন্ত্রে মানুষের সংখ্যা-পরিমাণ দ্বারাই রাজনৈতিক প্রভাব পরিমিত হয়। সুতরাং অদ্যাপি যদিও অর্থশালিতায়, বিদ্যাতে, সভ্যতায়, cultureএ বাঙ্গালী মুসলমানগণ বাঙ্গালী হিন্দুর সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই, তথাপি গণতন্ত্রমূলক শাসনে শাসনদণ্ড সংখ্যাভূয়িষ্ঠ মুসলমানগণের হাতে গিয়া পড়াতে এই সব বিষয়ে backwardnessও যে তাহাদের বেশীদিন থাকিবে তাহা মনে হয় না।

তারপর হিন্দুমুসলমানের এই তারতম্য ব্যতীত হিন্দুসমাজের সমক্ষে আরও সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুর নিম্নস্তরে আজও যাহারা মুসলমান অথবা খৃষ্টান হইয়া যায় নাই—সেই হিন্দুসমাজভুক্ত অনুন্নতশ্রেণী —তাহাদের লইয়াও এক সমস্যার উদ্ভব লইয়াছে। এতকাল ধরিয়া বহুশতাব্দী-প্রচলিত যে রকম ব্যবহার তাহারা উচ্চস্তরের হিন্দুদিগের নিকট হইতে পাইয়া নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া আসিয়াছে, আজ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মোহময় বাণী তাহাদেরও কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যাওয়াতে সেই চিরাচরিত বৈষম্য ও ঘৃণামূলক ব্যবহার তাহারা আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারাও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও নূতন সাম্যবাদে দীক্ষিত হইয়া সব বিষয়েই সমগ্র ভাবে হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরের জাতিদিগের ন্যায় সুযোগ সুবিধা ও ব্যবহার পাইবার আশা রাখে, এবং তাহা যদি না পায়, তবে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সংখ্যাও কিছু কম নয়। বাঙ্গালাতে যে সওয়া দুই কোটি হিন্দু আছে তাহার মধ্যে এক কোটি হইতে সওয়া কোটিই বোধ হয় এই নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত। এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে এখনও যাহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মপটু, স্বাস্থ্যবান্ তাহাদিগেরও অধিকাংশ এই নিম্নস্তরের মধ্যেই পাওয়া যায়। কবি গোল্ডস্মিথের বর্ণিত সেই "bold peasantry, their country's pride"—হিন্দু বাঙ্গালার সেই শক্তিশালী কৃষকসম্প্রদায় অনুন্নতশ্রেণীর নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, রাজবংশী ইত্যাদির মধ্যেই অধিকাংশ আবদ্ধ। তাহাদিগকে ছাড়িয়া, তাহাদিগকে হীনাবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া আজ এই প্রচণ্ড প্রখর জীবনসংগ্রামের দিনে বাঙ্গালী হিন্দু একপদ অগ্রসর হইবারও ভরসা করিতে পারে না।

ইহা ছাড়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও বাঙ্গালী হিন্দুর নেহাৎ কম নয়। এই যে অনুন্নত বলিষ্ঠ হিন্দু কৃষকসম্প্রদায়, ইহাদের মধ্যে অনেক জাতি এমন আছে যাহারা কন্যাপণ-প্রথায় একেবারে জর্জ্জরিত—টাকা না

দিতে পারিলে সেই সব নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহার্থ কন্যা পাওয়া যায় না অথচ টাকার সংস্থান নাই। সেই কারণে অনেক স্বাস্থ্যবান্ বলিষ্ঠ যুবক বাধ্য হইয়া অবিবাহিত থাকিয়া যায় এবং সেই সব শ্রেণীর মধ্যে বংশবৃদ্ধির প্রভূত বাধা ঘটে। হিন্দু নিম্নশ্রেণীর অনেকের মধ্যে এই সব এবং আরও নানাবিধ বাধা আছে, যাহা মুসলমানগণের মধ্যে নাই—যথা, হিন্দুর এক নিম্নশ্রেণীর লোক অন্য নিম্নশ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারেনা, ইত্যাদি। এই সব কারণে নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুও ক্রমশঃ মুসলমানদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় ন্যূন হইয়া দাঁড়াইতেছে। উচ্চস্তরের হিন্দুর সামাজিক সমস্যা একটু অন্যপ্রকার। তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজের দেখাদেখি standard of living বাড়িয়াছে, তদুপরি বরপণ-প্রথার বহুল প্রচার হইয়াছে, সুতরাং সহজে ছেলেরা বিবাহ করিতে চাহে না এবং সহজে কন্যাকর্ত্তারা মেয়ের বিবাহ দিতে পারিয়া উঠেন না; কাজেই ক্রমশঃই সন্তানসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। তাছাড়া, পূর্ব্বপ্রচলিত যৌথপরিবার-বন্ধন একরকম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একজনের আয়ে যে অনেক পরিবার পরিজন প্রতিপালিত হইত, সে প্রণালী উঠিয়া গিয়াছে—কতকটা পাশ্চাত্যের অনুকরণে individualism-এর প্রসারে, কতকটা নিছক economic pressure-এই—অথচ নূতন আয়ের পন্থা বিশেষ কিছু উদ্ভাবিত হয় নাই। ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি যাহাও কিছু বাড়িয়াছে তাহাতে বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর—business traditionএর অভাবেই হউক অথবা শ্রমবিমুখতার দরুণই হউক—বিশেষ কোন হাত নাই; তাহাদের অবলম্বন সেই মামুলী ভদ্রলোকী পেশা কয়েকটি, যথা রাজসরকারে চাকুরী, ডাক্তারী, ওকালতী, কেরাণীগিরি, মাষ্টারী, ইত্যাদি। তাহার সংখ্যা ত আর অপরিমিত নহে, পরন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিতেছে এবং চলাই স্বাভাবিক—সুতরাং ভীষণ বেকার-সমস্যা। এই অর্থ-নৈতিক সঙ্কটে বাঙ্গালী হিন্দুর পেটে অন্ন নাই,

দেহে স্বাস্থ্য নাই, হৃদয়ে বল নাই—হিন্দু-বাঙ্গালী নির্ব্বীর্য্য, নিশ্চেষ্ট, নিঃসম্বল, নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ করিয়া চলিতেছে মাত্র।

ভাবুক হিন্দু-বাঙ্গালী, আদর্শবাদী হিন্দু-বাঙ্গালী, হৃদয়বান্ হিন্দু-বাঙ্গালী, দেশভক্ত হিন্দু-বাঙ্গালী, বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত হিন্দু-বাঙ্গালী, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মুকুটমণি ছিল যে হিন্দু-বাঙ্গালী, তাহার আজ এই দশা! এত নানাবিধ গুণগ্রাম সত্ত্বেও তাহার আজ এই অবস্থা—রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিতে লুপ্তপ্রায়, সামাজিক ভেদ-বিবাদ-বিসংবাদে মৃতপ্রায়, অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রের পেষণে গতপ্রায়। ইহাই কঠোর সত্য। চক্ষু বুজিয়া থাকিলে কিংবা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইলে এই সত্যের কঠোরতা কিছুমাত্র কমিবে না, বরঞ্চ দুর্গতির আরও গভীরতর কূপে হিন্দু-বাঙ্গালী নিমজ্জিত হইবে। এই কঠোর বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে হইবে, লড়াই করিতে হইবে, যদি সম্ভব হয় তবে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশা করিবার যে খুব বেশী কিছু উপাদান আছে তাহা বলিতে পারি না—তবে জগতের ইতিহাসে কত অসাধ্য সাধন ত হইয়াছে, কত নিমজ্জমান জাতি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দু কি তাহা পারিবে না? হয়ত পারিবে। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে যদি পারিতে হয়, যদি নবজীবন লাভ করিতে হয়, যদি ভবিষ্যৎ জীবনচিত্র পুনরায় উজ্জ্বল তুলিকায় অঙ্কিত করিতে হয়, তবে খোসামুদি দ্বারা হইবে না, surrender দ্বারা হইবে না, defeatism দ্বারা হইবে না, inferiority-complex দ্বারা হইবে না, রমণীজনসুলভ অভিমানমূলক non-co-operation বা নেতিনেতিবাদ দ্বারা হইবে না। পৌরুষ সঞ্চয় করিতে হইবে, শক্তির সাধনা করিতে হইবে, বীর্য্যের আরাধনা করিতে হইবে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" প্রাচীন আর্য্যঋষির সেই তেজস্কর যজুর্মন্ত্র আমাদের জাতীয় জীবনের বীজমন্ত্র করিতে হইবে:

"ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওঁ ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।
ওঁ সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।
ওঁ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।"

আশ্বিন, ১৩৩৯।

হিন্দুস্থানে হিন্দুর স্থান

হিন্দুস্থানে হিন্দুর স্থান

বিগত পয়লা ভাদ্র তারিখে কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথিতে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জেমস্ র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যাবিষয়ক পয়লা নম্বর সিদ্ধান্ত সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে শুধু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি অনুসারে কি প্রকার সাম্প্রদায়িক বণ্টন-ব্যবস্থা হইবে তাহারই ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে কি রকম বণ্টন-ব্যবস্থা হইবে তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ; তবে ভবিষ্যতে যখন কেন্দ্রীয় শাসনের কাঠামো ঠিক হইবে তখন সে বিষয়ে দোসরা নম্বর সিদ্ধান্ত স্থির হইবে। পুনশ্চ হিসাবে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে ভারতের এই সাম্প্রদায়িক জঞ্জাল ঘাঁটিবার তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে এই ভার ঘাড় পাতিয়া লইতে হইয়াছে। এখনও যদি ভারতীয়েরা এই জঞ্জাল নিজেরাই আপোষ করিয়া মিটাইয়া ফেলিতে পারে, তবে তিনি সেই নিষ্পত্তিই মানিয়া লইবেন এবং নিজেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন।

কিন্তু এতাদৃশ মহানুভবতাপূর্ণ পুনশ্চ সত্ত্বেও সেই শুভ পয়লা ভাদ্র হইতে এই বিলাতী সিদ্ধান্ত লইয়া দেশময় একটা তুমুল কলরোল উঠিয়াছে।

হিন্দু বলিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ ঝর্ ঝরে হইবার আর বিলম্ব নাই, হিন্দুরা খালি ইংরাজের বিরুদ্ধে এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আন্দোলন করিয়া আসিতেছে, তাই তাহাদের এই প্রকার শাস্তি হইয়াছে, ইংরাজরা গোঁসা করিয়া মুসলমানের হাতে রাজ্যপাট সঁপিয়া দিতেছে, ইত্যাদি।

শিখ বলিতেছে, তাহারা রণজিৎ সিংহের বাচ্চা, একশত বৎসর আগেও তাহারা পঞ্চনদে ও পেশোয়ারে মুসলমানের উপর অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছে, আজ গণতন্ত্রের নামে তাহাদের উপরে মুসলমান-শাসন চাপান হইতেছে ইংরাজের দ্বারা, ইহা তাহারা কিছুতেই সহ্য করিবে না।

মুসলমান তাহাদের এই দ্বাদশ-বৎসর-ব্যাপী আন্দোলনের সাফল্যে আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তবু আবেগে কোন বিষয়ে সন্তোষ কিংবা আনন্দ প্রকাশ করা আধুনিক রীতিবিরুদ্ধ কি না, তাই তাহারা বলিতেছে, হইয়াছে নেহাৎ মন্দ নয়, তবে বাঙ্গালায় ও পঞ্জাবে আরও কেন কয়েকটা বেশী seat মুসলমানকে দেওয়া হইল না? না দেওয়াতে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন।

আর হিন্দু প্রতিবাদকারীদের প্রতি চোখ রাঙ্গাইয়া বাঙ্গালার মুসলমান বলিতেছে, তোমরা বাপু চেঁচামেচি করিতেছ কেন? তোমরা না গণতন্ত্রবাদী? গণতন্ত্র-শাস্ত্রে ত লেখে যাহাদের সংখ্যা বেশী তাহারাই মুল্লুকের মালিক হইবে। তবে তোমাদের আপত্তিটা কিসের? তোমরা বলিতেছ যে, জেলে গেল ফাঁসী গেল ভুগিয়া মরিল হিন্দুর ছেলেরা, এই স্বরাজ বা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রমূলক শাসন আনিবার জন্য, এখন তাহারা

চলিল আন্দামানে, আর মুসলমান করিবে রাজত্ব ? ইহা ত বাপু তোমাদের অত্যন্ত অন্যায় আব্দার। তোমরা ত হিন্দুর স্বরাজ আনিবার জন্য লড়াই কর নাই, করিয়াছিলে দেশের স্বরাজ আনিবার জন্য। তাহা ত এখন আসিয়া পড়িতেছে, কারণ আমরা মুসলমানেরাই ত দেশের অধিকাংশ। বৃথা হাত পা কামড়াইয়া মরিতেছ কেন ? আর যদি বল, খাটিয়া মরিলাম আমরা, আর ফলভোগ করিবে তোমরা—তা সে বিষয়ে ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রবচনই রহিয়াছে ঃ

Fools give feasts and wise men eat them,

Fools buy books and wise men read them ; etc.

আর তাছাড়া ইতিহাস দেখ না কেন ? ইংরাজরা দেড় শত বৎসর আগে বাঙ্গালা মুল্লুকটা লইয়াছিলেন কাহার হস্ত হইতে ? মুসলমানের হস্ত হইতে। এখন যখন ইংরাজগণ পাততাড়ি গুটাইতেছেন দেশে ফিরিবার জন্য, তখন ধর্ম্মে ন্যায়ে যুক্তিতে কি বলে ? কাহার হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিয়া দিয়া যাওয়া উচিত ? অবশ্যই মুসলমানের হাতে। এবিষয়ে কি সন্দেহ আছে ?

অন্যান্য ছোটখাটো যে সমস্ত সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সাধ্যমত তাহারাও চেঁচামেচি করিতেছে এবং প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়াতে যোগদান করিতেছে।

আর ইংরাজ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, এ কোন্ রকমটা বাপু তোমাদের ? নিজেরা ত এই কয় বৎসর ধরিয়া কত ঢলাঢলি গলাগলির অভিনয়ই করিলে—কত All-Parties Conference, আরও কত কি—একটা সোলেনামা ত আজ পর্য্যন্ত খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে না। তোমাদের সাম্প্রদায়িক শ্রাদ্ধ ত লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ অবধি গড়াইল। তোমাদের যে অদ্বিতীয় পয়গম্বর, সেই মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, I have tried my best and failed—I stand humi-

liated। তারপরে সকলে মিলিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে তোমরা বলিলে, দোহাই মহাশয়, যাহা হউক একটা মীমাংসা আপনি করিয়া দিউন, আপাততঃ আমরা তাহাই মানিয়া লইব। আর যেই তিনি তোমাদের অক্ষমতায় কৃপাপরবশ হইয়া তোমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তোমাদেরই স্বরাজের পথে কণ্টক দূর করিবার জন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন, অমনি তোমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রতি শ-কার ব-কার আরম্ভ করিলে। এ তোমাদের কি রকম ব্যাভার বাপু? তা এতই যদি রাগ, তোমরা নিজেরা রাগের মাথায়ই একটা রফা করিয়া ফেল না? মন্ত্রী মহাশয় ত তাঁহার পুনশ্চতেই সে কথা বলিয়া রাখিয়াছেন, তোমরা রফা করিতে পারিলেই তিনি অম্লানবদনে মানিয়া লইবেন। তবে এত নিরর্থক বাগাড়ম্বর কেন?

এই প্রকার নানাবিধ বাদবিতণ্ডায় তর্ক-কোলাহলে আজ এই প্রায় একমাস ধরিয়া ভারতবর্ষের, আর বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ও পঞ্জাবের, রাজনৈতিক আকাশ মুখরিত। কর্ণে বধিরতা জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে। একটা মজার জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়। এমনভাবে আলোচনা চলিতেছে যে এই সিদ্ধান্তের মূল কথাগুলি যেন নিতান্তই অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অপ্রত্যাশিত—যেন একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত। এরকম ভাবে যে একটা বন্দোবস্ত হইতে পারে রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টনের, এ যেন কেহ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই। তীব্র প্রতিবাদ অবশ্য বাঙ্গালী হিন্দুর তরফ হইতেই বেশীরকম আসিতেছে—শিখ তরফ হইতেও নেহাৎ কম নয়—কারণ এই সিদ্ধান্তে তাহাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইয়াছে। এবং তাহারা নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে যে এই অত্যন্ত সর্ব্বনাশকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহাদের লড়াই করিতেই হইবে।

কেহ বলিতেছে, তারস্বরে চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ কর। কেহ উপদেশ দিতেছে, Council হইতে সব বাহির হইয়া আইস,

ইংরাজ বুঝুক যে আমরা রাগ দেখাইতে জানি, আমাদের অভিমান বড় কম নয়। কেহ পরামর্শ দিতেছে, উহাতে প্রবল ইংরাজের মন ভিজিবেনা, direct action চাই, অর্থাৎ কিনা মহাত্মা গান্ধীর hands strengthen কর, অর্থাৎ গান্ধীর আইন-অমান্যের হিড়িকে হাজার তিরিশেক জেলে আছে আরও কয়েক হাজার গিয়া তাহাদের সঙ্গ লাভ করুক। কেহ তদুত্তরে বলিতেছে, ওসব বাজে কথা রাখিয়া দেও, ত্রিশ হাজারেই হইয়াছে বিস্তর স্বরাজ লাভ, আর সাড়ে বত্রিশ হাজারে একেবারে ভারত উদ্ধার হইয়া যাইবে? পাগল আর কাহাকে বলে? "এসব দৈত্য নহে তেমন"—"চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"—পার ত অন্য পন্থা ধর। এই প্রকার নানা মুনির নানা মত।

কিন্তু সব মতের মধ্যেই ঐকমত্য এই যে সকলেই এই pose-টুকু ঠিক ধরিয়া বসিয়া আছে যে এই যে award, ইহা যেন আমরা মোটেই প্রত্যাশা করি নাই, ইহা আমাদের কল্পনার একেবারে বাহিরে, এবং আজ যে এসম্বন্ধে এই প্রকার একটা মীমাংসা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের অদূর অতীতের রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে ইহার যেন কোন সম্পর্কই নাই, এবং আমাদের হিন্দুদের এ বিষয়ে যেন কোন দায়িত্বই নাই। আমরা শুধু প্রতিবাদ করিয়াই খালাস।

কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? আজ যে হিন্দুর সম্মুখে এমন একটা অবস্থা আসিয়া উপনীত হইয়াছে, যাহাতে তাহার সমস্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গাঢ়ান্ধকার হইয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থা আনয়নের জন্য হিন্দুর কি কোন দায়িত্ব নাই? হিন্দুর নিজের রাজনৈতিক কর্ম্মফলেই যে তাহাকে এই দশায় পতিত হইতে হইয়াছে, ইহা কি অস্বীকার করিবার? শুধু pose শুধু hypocrisy দ্বারা ও জনসাধারণের short memory-র উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই সত্যকে ঠেলিয়া রাখা যায় না। আর নিজেরা দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া আলগোছ হইয়া থাকিবার

চেষ্টা করিলেই সকল দায়িত্ব এড়ানো যায়না। এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটী পরের ঘাড়ে চাপাইয়া তারস্বরে প্রতিবাদ করিলেই ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠা মুছিয়া ফেলা যায় না। এই প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনায় কোন লাভ নাই, ইহাতে অন্যে প্রবঞ্চিত হয় না—নিজেদেরই সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হয় মাত্র।

যদি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য বাস্তবিক কোন প্রকৃত প্রেরণা থাকে, honest intention থাকে, তবে আমাদের কঠোর আত্মপরীক্ষা আবশ্যক। কি কি কার্য্যপন্থা আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়াছি, কোথায় আমাদের ভুল হইয়াছে, সেই ভুলের অবশ্যম্ভাবী কুফল কি কি হইয়াছে, সেই ভুল কি প্রকারে শোধরানো যায়, এবং সেই অতীত কর্ম্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসের আলোকে কি প্রকারে নূতন কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করা যায়, এই সব একান্তচিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে—সত্যভাবে, সুষ্ঠুভাবে, নিজকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করিয়া। নচেৎ শুধু আজ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, কাল মহম্মদ ইক্‌বাল, পরশু ভীমরাও আম্বেদকারকে গালাগালি দিয়া ইহকাল পরকাল কোন কালেই কার্য্য উদ্ধার হইবে না।

রাজনীতির সমস্যা ন্যায়ের একটা উপপত্তি নহে কিংবা জ্যামিতির একটা প্রতিজ্ঞা নহে যে একরকমেই মাত্র ইহার সমাধান সম্ভব। রাজনৈতিক সমস্যা সর্ব্বত্রই জটিল, ভারতবর্ষে আরও জটিল। বর্ত্তমান ভারত একটা সুন্দর সুশৃঙ্খল সংহতি লইয়া আজই আকাশ হইতে নামিয়া আসে নাই যে রাজনৈতিক theorist-দিগের একটা cut-and-dried solution দ্বারাই ইহার সর্ব্ববিধ সমস্যার একটা চমৎকার সমাধান হইয়া যাইবে, এবং তৎপরে সেই উপকথার নায়ক নায়িকার ন্যায়—we shall continue to live happily ever afterwards.

বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান ভারত রাষ্ট্রজগতে একটা আকস্মিক আবির্ভাব বা phenomenon নহে; ইহার প্রতি রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, অতীত ভারতের বিচিত্র ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে। ইহার জাতি-সমস্যা, ইহার বর্ণ-

সমস্যা, ইহার ভাষা-সমস্যা, ইহার দেশীয় ভারত-সমস্যা, ইহারা যে এক শতাব্দীর প্রবল বৈদেশিক শাসনের ফলে সব নিষ্পেষিত হইয়া চাপের চোটে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে। কতকটা নিষ্পেষিত হইয়াছে সত্য কিন্তু কোন সমস্যাই লুপ্ত হয় নাই, কতক সময়ের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। যেই মাত্র আজকাল এই কয়েক বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাসনযন্ত্রের চাপ একটু হ্রাস হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে, অমনই সেই সব পুরাতন সমস্যা, পুরাতন বিষ, পুরাতন দ্বন্দ্ব মাথা খাড়া করিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। তাই আজ ইংরাজের আংশিক অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনাতেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, দেশীয় রাজন্যবৃন্দের ambition, মুসলমানের Pan-Islam, ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রবলভাবে দেখা দিতেছে। এই সমস্ত লক্ষণ ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের প্রচণ্ড struggle for supremacy-র পূর্ব্বাভাস মাত্র। তাই বলিতেছিলাম ভারতবর্ষের সমস্যা জটিল সমস্যা, বৈদেশিক শাসনের বিলোপ-সাধন করাই ইহার প্রধানতম সমস্যা নহে, ইহা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। ভারতের জাতীয় জীবনের বড় বড় সমস্ত সমস্যাই ইহার পরে।

তাই আজ নির্ভীকভাবে, কাহারও খাতির না রাখিয়া, বিচার করিবার সময় আসিয়াছে, আজকার দিনের এই ইংরাজনির্দ্দিষ্ট communal award-এ যে সমস্ত মূলনীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং যাহার ফলে হিন্দুস্থানে হিন্দুপ্রাধান্য বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে—এই সকল নীতির জন্য হিন্দু নিজে কতটা দায়ী।

একটু গোড়া হইতেই আলোচনা সুরু করা যাউক।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষেই প্রথমে ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলন জাগিয়া উঠে—সেই জাতীয় হোমানল প্রথম প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন বাঙ্গালার হিন্দু নেতা সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ। ইহাই বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলন।

বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমশঃ আন্দোলনের প্রসার ও গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে জাতীয় স্বাধীনতার ও ভারতীয় সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দাবীতে পরিণত হইল। এবং সেই আন্দোলনের তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে প্রধানতঃ বাঙ্গালার বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতির অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফলে সুদূর মহারাষ্ট্র ও পঞ্চনদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িল। পরে বঙ্গ মারাঠা পঞ্জাবের লাল বাল পাল * গোটা ভারতবর্ষকেই জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সেই আন্দোলন পরিশেষে বিপ্লবপন্থীদিগকে জন্মদান করিলে জাতীয়-স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার ধারা কতক পরিমাণে অন্য খাতে গিয়া পড়িল। সে যাহাই হউক, যেজন্য প্রধানতঃ আন্দোলনের উদ্ভব —বঙ্গাবভাগ রহিত করা—তাহা জয়যুক্ত হইল। বঙ্গবিভাগ উঠিয়া গেল, মোটামুটিভাবে বঙ্গভাষাভাষীকে এক প্রদেশের মধ্যেই রাখা হইল, ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটা বড় রকমের settled fact unsettled হইল, সুরেন্দ্রনাথের Surrender Not আখ্যা সার্থক হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষে আসিলেন তখন তাঁহার মুখ দিয়াই এই unsettlement-এর বাণী ঘোষিত হইল। বাঙ্গালী হিন্দুর আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইল।

হিন্দুর পক্ষে প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে এই আন্দোলনে, মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, মুসলমানগণ যোগ দেয় নাই। বরং অনেকস্থলেই বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে। তথাপি হিন্দু-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন সফল হইয়াছে। মুসলমানগণের সাহায্য বাঞ্ছা করিয়া তাহাদিগকে দলে আনিয়া দলপুষ্টি করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সমক্ষে united front দেখাইবার আবশ্যকতা তৎকালীন বাঙ্গালী হিন্দু নেতারা অনুভব করেন

* লাল—লালা লাজপত রায়।
বাল—বাল গঙ্গাধর তিলক।
পাল—বিপিনচন্দ্র পাল।

নাই। তাই বলিয়া তাঁহারা যে মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাহা নহে; তাঁহাদের ভাব ছিল এই যে মুসলমানগণ জাতীয় আন্দোলনে আসে উত্তম, না আসে ত তাহাদের পায়ে ধরিয়া আনিবার কোন আবশ্যকতা নাই; হিন্দুরা নিজে যাহা করিতে পারে তাহাই কায়মনোবাক্যে করিতে থাকুক। তাহাদের এই attitude-এর ফলে আন্দোলনের শক্তি বা তীব্রতার কিছুমাত্র হানি হয় নাই—ফলেই তাহার পরিচয়।

ইতিমধ্যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার পূর্ব্বেই, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনের ফলে শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইল—সেই শাসনসংস্কার Morley-Minto Reforms বলিয়া পরিচিত। সেই Reforms-এর সহিত আজকার এই award-এর কিছু সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্কটি এই। আজ যে শাসনযন্ত্রে separate electorate প্রণালী এতটা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার প্রথম সূত্রপাত এই Morley-Minto Reforms-এ। হিন্দুরা রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছে, পরন্তু মুসলমানেরা তাহাদিগকে সাহায্যই করিয়াছে, সম্ভবতঃ অনেকটা এই কারণেই, এবং তাছাড়া পশ্চাৎ-প্রসিদ্ধ গান্ধী-ভ্রাতা মৌলানা মহম্মদ আলি—তৎকালে হিন্দুদ্বেষী "Comrade" সম্পাদক মিঃ মহম্মদ আলি—এবং আগা খাঁ দ্বারা প্ররোচিত হইয়া, সেকালের বড়লাট মিণ্টো সাহেব সামান্য আকারে মুসলমানদিগের জন্য separate communal electorate-এর ব্যবস্থা করিলেন। যাহা হউক, সে বন্দোবস্ত এত যৎসামান্য ছিল যে তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় নাই, এবং তজ্জন্য হিন্দু নেতারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র দায়ী ছিলেন না। পরন্ত হিন্দু আন্দোলনেই শাসনযন্ত্র সংস্কৃত হইল, তারপর বঙ্গবিভাগ রহিত হইল—ইহাতে হিন্দুর প্রভাব ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বাড়িয়াছিল বই কিছুমাত্র কমে নাই। ইতঃপূর্ব্বেই বড়লাটের শাসন পরিষদে বা Executive Council-এ প্রথম ভারতীয় প্রবেশ করিলেন হিন্দু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

আরও একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার। যদিও উক্ত শাসন-সংস্কার একেবারে মনঃপূত হয় নাই এইরূপ অসন্তোষ সকলেই প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি নূতন শাসনযন্ত্র boycott করিতে হইবে এরূপ উদ্ভট কল্পনা কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। পরন্তু তৎকালীন হিন্দু নেতারা যে অল্পবিস্তর ক্ষমতা শাসন-সংস্কারে পাইয়াছিলেন, তাহা পূরামাত্রায় স্বদেশের হিতকল্পে ব্যবহার করিতে মনঃস্থ করিলেন, অথচ তজ্জন্য আরও বিস্তৃততর ক্ষমতা পূর্ণতর অধিকার লাভ করিবার নিমিত্ত আন্দোলনে বিরত হন নাই; এবং তাহারই ফলে ঠিক আইনের ধারায় যতটুকু ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল, তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁহারা শাসনযন্ত্রের উপর বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯০৯এর Morley-Minto সংস্কারে এবং ১৯১১তে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়াতে রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা ও তিক্ততা স্বভাবতঃই অনেকটা দূরীভূত হইয়া গেল। এইরূপে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। সেই অভাবনীয় বিশ্বত্রাসকারী ব্যাপারে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল। মহাযুদ্ধে দলে দলে ভারতীয় সৈন্য ইউরোপে প্রেরিত হইতে লাগিল এবং তাহারা তথায় যথেষ্ট কৃতিত্ব ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। সেই সেনাগণের শৌর্য্য ও ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃগণ ভারতবর্ষের আরও পূর্ণতর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণও তখন, ঘোর বিপদের সম্মুখীন হওয়ায়, সকলকেই সকল বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে লাগিলেন। এতকালের প্রচণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সব হঠাৎ রাতারাতি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জাতিসমূহের রক্ষক এবং উদ্ধারকর্ত্তা সাজিয়া অভয়বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। Right of nationalities, self-determination, ইত্যাদি গালভরা বাণী ভূতের মুখে রাম নামের ন্যায়

সাম্রাজ্যমদগর্ব্বী ইংরাজের মুখে জার্ম্মানীর গুঁতায় বাহির হইতে লাগিল। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিং সহানুভূতির সুরে বলিলেন, "India has been bled white" ; বিলাতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, ভারতের কি অদ্ভুত রাজভক্তি, কি অভূতপূর্ব্ব ত্যাগ, কি অসীম বীরত্ব ! আবার যেমন একদিকে প্রশংসার ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, তেমনি অপরদিকে নানা প্রকার পন্থা ও অপন্থা অবলম্বন করিয়া পঞ্জাবের জবরদস্ত লাট সার মাইকেল ওডোয়াইয়ার লক্ষ লক্ষ শিখ সৈন্য ইউরোপে পাঠাইতে লাগিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দও, মনে মনে যাহাই থাকুক না কেন, তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, ইংরাজের বিপদ্ আমাদেরই বিপদ্, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে আমাদিগের প্রাণপণ করা কর্ত্তব্য। এমন যে মহাত্মা গান্ধী—যিনি অহিংসাবাদের একটি অবতার রূপে পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত—তিনিও আপাততঃ অহিংসামন্ত্র ধামা চাপা দিয়া রাখিয়া মহাযুদ্ধে জার্ম্মান বধের নিমিত্ত ভারতীয় সৈন্য recruit করিবার আড়কাটিরূপে অবতীর্ণ হইলেন। হঠাৎ রাজভক্তির বন্যায় ভারত ডুবু ডুবু হইবার উপক্রম হইল ; এবং ভারতীয় সৈন্যদিগের ত্যাগ ও বীরত্ব, ও নিজেদের এই প্রচণ্ড রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ আমাদের নেতারা সব পূর্ণতর স্বরাজের জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন। একেবারে যেন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি পড়িয়া গেল।

অপর দিকে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অন্য আকার ধারণ করিয়া উঠিল। এই সময় হইতেই বিখ্যাত united front-এর theory জাতীয় কর্ম্ম-পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস, যাহা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সুরাট দক্ষ-যজ্ঞের পরে আট-নয় বৎসর কাল সুরেন্দ্রনাথ গোখলে প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের করায়ত্ত ছিল—এবং যে কংগ্রেসকে তখনকার গরমপন্থী নেতা লোকমান্য তিলক বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ প্রভৃতি boycott করিয়াছিলেন—সেই কংগ্রেস

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে সম্মিলিত হইল। সভাপতি হইলেন বাঙ্গালার অন্যতম নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়। নরম ও গরম দলের একত্র সমাবেশ হইল। তাছাড়া মুসলমানগণ এই কয় বৎসরে নিজে-দের একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উহার নাম Moslem League; উহা এক রকম মুসলমানদের কংগ্রেস বলিলেই হয়। এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস উপলক্ষে একটা বিশেষ চেষ্টা হইল কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগের দাবীর সমন্বয় করিয়া হিন্দু-মুসলমানের একটা আপোষ মীমাংসা করিবার।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হিন্দুনেতৃগণের যে তেজ যে বীর্য্য যে মেরুদণ্ড দেখা গিয়াছিল, তাহা কি রকম করিয়া যেন এতদিনে উবিয়া গিয়াছিল—তাঁহারা ক্রমশঃ defeatism-এ আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। যে ক্রম-বিবর্দ্ধমান defeatism আজ ষোল বৎসর ধরিয়া হিন্দু-সমাজকে হিন্দু leadership-কে ক্রমাগতই নিস্তেজ ও পঙ্গু করিয়া আনিতেছে, সেই defeatism-এর প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্ণৌতে। হিন্দু নেতাদিগের attitude হইল এই যে ইংরাজকে ধাপ্পা দিতে হইবে, তাহাকে impress করিতে হইবে যে আমরা সব ভাই-ভাই, সব এক দিল; নহিলে শুধু হিন্দুর কথায় ইংরাজরা আমাদিগকে স্বরাজ দিবে না; অতএব চাই united front। যদি সেই united front-এর জন্য মুসলমানের বেশী গরজ না থাকে, তবে তাহাদেব হাতে পায়ে ধরিয়া রাজী করাইতে হইবে। কারণ হিন্দুরই যে মাতৃশ্রাদ্ধ, এবং সে একা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেনা।

সুবিধা পাইয়া মুসলমানও বাঁকিয়া বসিল। কিছুতেই রাজী হইবে না—যদি না তাহাদের জন্য separate electorate-এর ব্যবস্থা হয়। হিন্দু নেতারা বলিলেন, তথাস্তু, তাই সই। ইহাই হইল সুবিখ্যাত Lucknow Pact-এর উৎপত্তি। Morley-Minto Reforms

এর সীমাবদ্ধ separate electorate-এ হিন্দুর কোন দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের দায়িত্ব ষোল আনা যে হিন্দুর । এই প্যাক্টের পরে separate electorate সম্বন্ধে হিন্দুর মুখ বন্ধ—যাহাকে আইনের ভাষায় বলে estopped। আজ ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের মস্তকে অভিসম্পাত বর্ষণ করিলে কি হইবে?

হিন্দু surrender-এর ইহাই হইল প্রথম অঙ্ক। তবে তৎকালীন নেতাদের স্বপক্ষে যেটুকু বলিবার আছে, সেটুকুও ন্যায় ও সত্যের খাতিরে স্পষ্টই বলিয়া রাখা উচিত—সে কথা এই যে তাঁহারা united front-এর অনুসরণে separate electorate-এ রাজী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা বেশী অনিষ্ট কিছু করেন নাই। তাঁহাদের সোলেনামায় give and take ছিল; মুসলমানগণ যে সমস্ত স্থানে সংখ্যাল্প, সে স্থানে হিন্দু নেতারা weightage দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপরপক্ষে যে প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় ভূয়িষ্ঠ সেখানে তাহাদিগকে ভূয়িষ্ঠ সংখ্যা দেন নাই, অনেক কম দিয়াছিলেন। যেমন বাঙ্গালাদেশে মুসলমানসংখ্যা সেই সময়ে শতকরা পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলেও লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে মাত্র শতকরা ৩৯ জনের ব্যবস্থা ছিল; পঞ্জাবেও তদ্রূপ।

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ত স্বাক্ষরিত হইয়া গেল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন হিন্দুমুসলমান নেতাদিগের দ্বারা। ইহার কিছুদিন পরে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে, সুরেন্দ্রনাথ-পরিচালিত কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে, মণ্টেগু সাহেবের ঘোষণা বাহির হইল। সেই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই মণ্টেগু সাহেব স্বয়ং ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন, তৎকালীন বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ড সাহেবকে বগলদাবা করিয়া সারা ভারতময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন, ভারতীয় নেতৃগণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, এবং কিছুদিন পরে সফর সাঙ্গ করিয়া বিলাতে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পরে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট বাহির হইল।

মজার কথা এই, ১৯১৭--১৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যখন মণ্টেগু সাহেব সফরে বাহির হইলেন, তখন তাহা boycott করিবার কল্পনা কাহারও মাথায় উঠিল না। এ কথা কেহই বলিলেন না, কেন মণ্টেগু সাহেব তাঁহার অপর বগলে একজন কালা আদমী লইয়া ঘুরিলেন না? যে all-white Commission নিযুক্ত হওয়াতে দশ বৎসর পরে তুমুল আর্ত্তনাদ তুলিয়াছিলেন ভারতের হিন্দু রাষ্ট্রনেতাদিগের সব সম্প্রদায় —সাপ্রু শাস্ত্রী বিপিনচন্দ্র হইতে নেহ্‌রু গান্ধী লাজপত পর্য্যন্ত—যে আমরা all-white Commission চাই না—"Go back Simon"—আমরা চাই black and white—কৈ, মণ্টেগু সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে একা আসিয়া নিরীহ চেম্‌স্‌ফোর্ডকে দোহার স্বরূপ লইয়া যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টহল দিয়া বেড়াইলেন তখন ত সেই আর্ত্তনাদের টুঁ-শব্দ পর্য্যন্ত শুনা গেল না?

সে যাহা হউক মণ্টেগু সাহেব ত ভারতভ্রমণ করিয়া বিলাতে ফিরিয়া গেলেন এবং যথাসময়ে Lionel Curtis মহাশয়ের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত Dyarchy সন্তানটিকে সাধারণ্যে কাপড় চোপড় পরাইয়া বাহির করিলেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সেই কাপড়-চোপড় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের বস্ত্রশালা হইতেই তিনি আহরণ করিলেন; অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সাম্প্রদায়িক বণ্টন-বিভাগই ইংরাজ দ্বারা মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে বিধিবদ্ধ হইল। লক্ষ্ণৌ রোপিত বিষবৃক্ষটি কিঞ্চিৎ সংবর্দ্ধিত হইল।

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধও শেষ হইয়া গেল, ইংরাজ তাহার খুড়তুত ভাই Uncle Sam-এর বংশধরদের কৃপায় জয়যুক্ত হইলেন, এবং যুদ্ধের হাঙ্গামায় পড়িয়া যে সমস্ত লম্বা লম্বা বুলি আওড়াইতে হইয়াছিল, সেইগুলি কি প্রকারে

decently হজম করা যায় সেই ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন। এবং কৃতকার্য্যও হইলেন অনেকটা। ইস্কুল-মাষ্টার প্রেসিডেণ্ট উইলসন সাহেবের চতুর্দ্দশপদী রচনা সুচতুর এটর্ণী লয়েড জর্জ্জ সাহেবের ইন্দ্রজালে কোথায় যে উড়িয়া গেল কেহ কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। ভের্সাইয়ের কলকোলাহল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া গেল যে ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ উপনিবেশগুলি এবং তুরস্কের অধিকাংশ প্রদেশ mandate-এর আবরণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্তরাগরঞ্জিত সীমা আরও বিস্তৃত করিয়াছে; ফ্রান্সও ছিটাফোঁটা পাইয়াছে; জার্ম্মানী খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছে, এবং তাহার উপর বিপুল অর্থদণ্ড চাপান হইয়াছে; আর সেই যে small nationalities এবং তাহাদের self-determination, তাহার অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং। Fourteen points-এর ঝুলি ঝাড়িয়া দেখা গেল, আর কিছুই নাই, আছে শুধু আকাশকুসুমের একটু কলি; সেই কলিটিকে রোপণ করা হইল, সেটি জেনিভাতে ফুটিয়া উঠিল League of Nations রূপে। ভগ্নমনোরথ ভগ্নস্বাস্থ্য ভগ্নহৃদয় উইলসন সাহেব দেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং কিছুকাল পরে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশপদীর একমাত্র মূর্ত্তসন্তান সেই কলিটিকে আমেরিকা স্পর্শ মাত্র করিল না। এই গেল বিদেশের সন্দেশ।

আমাদের দেশে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। লড়াইয়ের সময় যে Defence of India Act বলবৎ ছিল—যাহার বলে এনি বেসাণ্ট, মহম্মদ আলি প্রমুখ শত শত ব্যক্তিকে interned করা হইয়াছিল—সেই আইনটি যুদ্ধাবসানের ছয় মাস পরে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনাতে উহারই প্রধান প্রধান বিষয়গুলি কায়েমী ভাবে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Rowlatt Bill-এর প্রণয়ন হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বিলের প্রণয়ন-প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল বলিলেই হয়, তাহা কখনও কার্য্যতঃ প্রযুক্ত

হয় নাই। এই বিলের বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ নেতারা Imperial Council-এ উহার বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংস তূণীর হইতে সত্যাগ্রহ-অস্ত্র বাহির করিলেন, তারপর অবিলম্বে গ্রেপ্তার হইলেন, সমগ্র উত্তর ভারতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, পঞ্জাবে ত রীতিমত বিপ্লবেরই সূচনা হইল, সেই বিপ্লবসূচনা ভীষণভাবে নিষ্পেষিত হইল—জালিয়ানওয়ালাবাগ হইল, martial law পর্য্যন্ত হইল। এই সব গুরুতর ব্যাপারে, ক্ষোভ ও অশান্তির বহ্নি সারা ভারতময় প্রধূমিত হইতে লাগিল—অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার knighthood পরিত্যাগ করিলেন।

অপরদিকে ইউরোপে সেভ্‌র্‌ সন্ধিতে তুরস্ককে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতে লাগিল—তাহার প্রতিক্রিয়াহিসাবে ভারতীয় মুসলমানদিগের মনেও ইংরাজ-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বেই অর্থাৎ মহাযুদ্ধের সময়ে মহম্মদ আলি ও শৌকৎ আলি দুই ভাই অন্তরীণ হইয়াছিলেন, ১৯১৯এর শেষ ভাগে ইঁহারা মুক্তি পাইয়া খিলাফৎ আন্দোলনের প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন—উদ্দেশ্য যাহাতে তুরস্কের খলিফার প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। এই আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

পঞ্জাবের বিপ্লবদমন, সেভ্‌র্‌ সন্ধিতে তুরস্কের শাস্তি, ইত্যাদি আকস্মিক ও অভাবনীয় ব্যাপারে যখন ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়ের মন ক্ষুব্ধ, সেই সময়ে নূতন শাসনপ্রণালী—Montagu-Chelmsford বা সংক্ষেপে Mont-Ford Reforms—বিধিবদ্ধ হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল। বস্তুতঃ Mont-Ford Reforms-এর merits অথবা demerits-এর সহিত এই সব ঘটনাবলীর কোনও সম্পর্কই ছিলনা। কিন্তু মন যখন বিকল থাকে তখন ধীরভাবে বিবেচনার অবসর বড় একটা থাকেনা। ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদিগেরও হইল সেই অবস্থা—একটা

বিরূপ বিদ্বিষ্ট ভাবে অন্তঃকরণ তখন ভরপূর। তথাপি ব্রিটিশরাজ জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার ত্রুটী করিলেন না —internee-দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, general amnesty করিয়া আন্দামান হইতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ অনেক রাজবন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, বিলাত হইতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পিতৃব্য ডিউক্-অব্-কনট্ আসিয়া স্বীকার করিলেন, The shadow of Amritsar has lengthened over the whole of India, এবং নব শাসনপ্রণালী তিনি প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়া গেলেন।

পঞ্জাব বিপ্লবের পর, সেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাঙ্গণেই কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। আব্‌হাওয়া তখন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু সভাপতি পদে বৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, তজ্জন্য নব শাসনপ্রণালী boycott করিয়া ত কোনও লাভ নাই—তাহা unsatisfactory সত্য, কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীও সেই কথা সমর্থন করিলেন। এবং সেই মর্ম্মেই কংগ্রেসের মন্তব্য নির্দ্ধারিত হইল।

বস্তুতঃ যদিও সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেই কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই, তথাপি অমৃতসর কংগ্রেসের মন্তব্য ও সুরেন্দ্রনাথের দলস্থ ব্যক্তিদিগের রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিলনা। অথচ এক বৎসর পরে, অমৃতসরে গান্ধী-নেহ্‌রু যে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তদনুসারে কার্য্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় জননায়কের কি লাঞ্ছনাই না সহ্য করিতে হইয়াছিল! রাজনীতির কি কঠোর পরিহাস! রাতারাতি মত পরিবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথই দেশদ্রোহী বনিয়া যান নাই—মত পরিবর্ত্তন গান্ধী-নেহ্‌রুই করিয়াছিলেন।

মহাত্মার মত বদলাইয়া গেল কখন? না, যখন ছয়মাস পরে Hunter Committee পঞ্জাব অনাচার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট বাহির করিলেন, জেনারেল ডায়ারকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিলেন, লালা হরকিষণ লাল প্রভৃতি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন, তখন। কারণ, তিনি এবং কংগ্রেসনিযুক্ত তদন্তকমিটি আরও যে যে প্রতিকার চাহিয়াছিলেন, তাহা হাণ্টার কমিটি গ্রহণ করেন নাই; অর্থাৎ কিনা যথোচিত প্রতিকার হয় নাই। সুতরাং এতদিনে তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট dishonest এবং যেহেতু dishonest অতএব satanic, এবং শয়তানের সঙ্গে রফা করা অসম্ভব, কাজেই, non-co-operation। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের পরও সেই রক্তরঞ্জিত ক্ষেত্রে বসিয়া অমৃতসর কংগ্রেসে যে মহাত্মা গান্ধী Montagu Reforms work করিবার পরামর্শ দিলেন, তিনিই হাণ্টার কমিটির প্রতিকার ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে মনে করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সেই Reforms-কে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যুক্তির মাহাত্ম্য বটে! যে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন এতকাল political plane-এ ছিল, তাহা মহাত্মার কল্যাণে এখন theological planeএ উঠিল।

ইহার পর আসিল ভারতীয় ইস্‌লামের খিলাফৎ-জনিত ক্রোধ। ইংরাজ তুর্কী-খিলাফৎকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, এই বিশ্বাসে আলিভ্রাতৃদ্বয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। তুর্কী-খিলাফৎকে যে তুর্কী কামালপাশা নিজেই তরবারি দ্বারা নিকাশ করিয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে খেয়াল করিবার অবকাশ আলিভাইদের বড় একটা দেখা গেলনা। তাঁহারা তাঁহাদের ইস্‌লামী সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য বড় সহকর্ম্মী পাইলেন মহাত্মা গান্ধীকে। আবার সেই united front-এর অভিনয় আরম্ভ হইল। গান্ধী মহাত্মা ভারতীয় স্বরাজ আন্দোলনের স্কন্ধে তুর্কী খিলাফৎ উদ্ধারের গুরুভার অম্লানবদনে চাপাইয়া

দিলেন। কিন্তু আলিভাইদিগকে ভারত উদ্ধারের জন্য মস্তিষ্ক পীড়িত করিতে মোটেই দেখা গেল না—তাঁহারা খিলাফতের ও জাজিরাৎ-উল-আরবের প্রাচীন মহিমা পুনরুদ্ধার করিতেই ব্যস্ত। তাই মহাত্মাজীর non-co-operation-এর joint programme ত্রিধাবিভক্ত হইল, Punjab wrongs, Khilafat, and Swaraj—অর্থাৎ ভারতের স্বরাজ-সাধনা বিনীত ভাবে তৃতীয় স্থানে গিয়া বসিল।

ভারতের পরম দুর্ভাগ্য যে ঠিক এই সময়েই লোকমান্য তিলক লোকান্তরিত হইলেন। ঠিক একই তারিখে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পয়লা আগষ্ট, তিলকের মহাপ্রয়াণ এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ অভিযানের ঘোষণা সংঘটিত হইল। একমাত্র যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহার অসামান্য ত্যাগ, মনীষা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও জনপ্রিয়তা দ্বারা গান্ধীর প্রভাবকে দমিত রাখিয়া ভারতীয় রাজনীতিকে practical politics-এর খাতে চালিত করিতে পারিতেন সেই বাল গঙ্গাধর তিলক এই সন্ধিক্ষণে ভারতের রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইলেন। ইহার ফলে দেশের যে কতদূর ক্ষতি হইল তাহা পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের ইতিহাসেই প্রকটিত হইয়াছে।

পয়লা আগষ্ট তারিখে ত্রিধাবিভক্ত অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিয়াই মহাত্মা গান্ধী সয়তানী গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে আসরে নামিলেন। নামিয়া প্রথমেই যে অভিযান আরম্ভ করিলেন তাহাতে লোকে একেবারে থ' হইয়া গেল। প্রথম আক্রমণই তাঁহার আরম্ভ হইল দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে। লোকে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, ইস্কুল কলেজ ধ্বংস হইলে গভর্ণমেণ্টের কি ক্ষতিটা হইবে? নিজেদের যুবকবৃন্দেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে। আবার মজা এই যে গান্ধী মহাত্মার শিক্ষায়তন ধ্বংসাভিযানের প্রথম ও প্রধান আক্রমণই হইল, সরকারী ইস্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে নহে—আক্রমণ হইল কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে। পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়—

যিনি তাঁহার আজীবন চেষ্টার ফলে কাশীর এই বিরাট্ অনুষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন—তিনি সকাতরে অনুনয় করিলেন, দোহাই মহাত্মাজী, আমার প্রাণ দিয়া গড়া এই জিনিষটি আপনি নষ্ট করিবেন্ না। বহু সাধ্যসাধনার ফলে মহাত্মাজী বিরত হইলেন। তারপর তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিতে লাগিলেন একেবারে পিঞ্জরমুক্ত উন্মত্ত কেশরীর ন্যায় —লোকে আতঙ্কিত হইল কখন্ কোথায় তিনি কি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বসেন।

আর এই ধ্বংসাভিযানে তাঁহার সহকর্ম্মী জুটিল কোন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা নয়, জুটিল যত সব ধর্ম্মান্ধ মোল্লা মৌলবীর দল— যাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ "রুম"-এর দিকে, যাহাদের নবলব্ধ মন্ত্র হইল খিলাফৎ উদ্ধার, এবং যাহারা ভারতের শাসনসংস্কারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। খিলাফৎ ভলাণ্টিয়ারের দ্বারা সহরে সহরে হরতাল সংঘটিত হইতে লাগিল। খিলাফতের মহিমা ও জাজিরাৎ-উল-আরবের মাহাত্ম্যের চীৎকারে ভারতের গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। ইস্তাম্বুল হইতে বিঘূর্ণিত খিলাফৎ-চক্রের আবর্ত্তনে ভারতের রঙ্গমঞ্চ আলোড়িত হইতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই অদ্ভুত ইস্‌লামী ব্যাপারের কর্ণধার হইলেন ভারতের হিন্দুনেতা মহাত্মা গান্ধী। এবং কখন? না, যখন নবজাগরিত তুরস্কের নেতা স্বয়ং কামাল পাশা খিলাফতের দফা একদম রফা করিয়া দিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

এই যখন অবস্থা তখন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত কলিকাতায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল; সভাপতি হইলেন লালা লাজপত রায়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নেতাই গান্ধীর অসহযোগ অভিযানের বিরুদ্ধে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ত কথাই নাই, গরমপন্থী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, সেই বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, হীরেন্দ্র-নাথ, ব্যোমকেশ, অশ্বিনীকুমার, মদনমোহন, মতিলাল, প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও

অসহযোগের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে শাসনযন্ত্র হইতে নিজেদের হস্ত অপসৃত করিলে নিজেদের শক্তি কি প্রকারে বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এই সব দেশভক্ত মনস্বী নেতা, এমনকি স্বয়ং সভাপতি লালা লাজপত পর্য্যন্ত non-co-operation-এর বিরুদ্ধতা করিলেও খিলাফতী দাপটের বিরুদ্ধে তাঁহারা টিঁকিতে পারিলেন না। গান্ধীর মাহাত্ম্যের সহিত আলীভাইদের সংগৃহীত পেশোয়ারী ইস্‌লামী চমূর বাহু-বল সম্মিলিত হইয়া রাজনৈতিক ভারতের পরাজয় সাধন করিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সেই পরাজয় বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে এক পরম দুর্দ্দিন।

এই unholy alliance-এর যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাই ফলিতে লাগিল। যে খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয়তার কোন সম্পর্ক নাই, যাহা মধ্যযুগীয় ধর্ম্মান্ধতার একটা নিদর্শন বলিলেই হয়, যে খিলাফৎকে আধুনিক তুরস্ক জার্ণবসনের ন্যায় ঘৃণায় পরিহার করিয়াছে—সেই খিলাফতের চেলারা মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় প্রকাণ্ড মুরুব্বি পাইয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। যে আলীভাইদের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে কোন স্থানই ছিল না বলিলে হয়, তাঁহারা হঠাৎ প্রচণ্ড জাতীয় নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। আর যত গোঁড়া মোল্লা ও মৌলবীর দল গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া নিরক্ষর মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে গোঁড়ামির ও fanaticism-এর বীজ বপন করিয়া ভারতবর্ষে ইস্‌লামের স্বতন্ত্রতার ধারণাটি বহুব্যাপকরূপে ছড়াইয়া দিল। ইস্‌লাম যে ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক রাখে না, তাহার affiliation এবং loyalty যে আরব ও তুরস্কের প্রাপ্য, এই সংস্কারটি সুদূর গ্রামে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়াতে একটা সুসংহত একতাবদ্ধ ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতিগঠনের চেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত হইল।

এইরূপ অদ্ভুত আত্মঘাতী প্রচেষ্টা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? গান্ধী-স্তাবকগণ বলিয়া থাকেন যে মহাত্মাজী সদুদ্দেশ্যেই এই খিলাফতে ঝাঁপাইয়া

পড়িয়াছিলেন—উদ্দেশ্য, যদি এই ভাবে মুসলমান fanaticism-এ ইন্ধন যোগাইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দুমুসলমানের united front ঘটাইয়া তুলিতে পারেন।

কিন্তু যে united front-এর পশ্চাতে কোন সত্যকার unity নাই, জাতিগত unity নাই, এমন কি আদর্শগত unity-ও নাই, তাহার স্থায়িত্ব আর কতদিন? যেই মুস্তাফা কামাল নিজের বাহুবলে গ্রীককে পর্য্যুদস্ত করিয়া তুরস্কের নব প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, আলীভাইদের সাধের খিলাফৎকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিলেন, পাশ্চাত্য জাতিদিগকে তাঁহার সমরকৌশলে স্তম্ভিত করিলেন, আর লোজান্ সন্ধি দ্বারা সেভ্‌র্‌ সন্ধির বিষময় ফল দূরীভূত করিলেন, অমনি এই ইস্‌লামী আন্দোলনের আর কোন আবশ্যকতা রহিল না, আলীভাইরা মহাত্মার নিকট হইতে দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল—এত সাধের united front, হিন্দু-জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া যে মিলনসৌধের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল, সেই মিলনসৌধের মায়াময় facade নিমেষেই ভাঙ্গিয়া পড়িল, ইংরাজের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইল না। লাভের মধ্যে হইল এই যে, যে বিপুল অন্ধশক্তি মুসলমানদের মধ্যে জাগরিত হইয়াছিল এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল, সেই শক্তির দুর্ব্বার অত্যাচার হিন্দুর উপর গিয়া পড়িল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে পৈশাচিক লীলার অভিনয় হইল, আর সারা উত্তরভারত ব্যাপিয়া হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ এবং দাক্ষিণাত্যে মোপ্‌লারাজের অত্যাচার আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল।

খিলাফতে প্রতিক্রিয়ায় সারা ভারতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইল। হিন্দুভারত নিজের বুকের রক্ত দিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিল। আর সেই বিষময় ফল দর্শনে মহাত্মা গান্ধী কি করিলেন? দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলির বাড়ীতে বসিয়া তিন সপ্তাহ উপবাস করিলেন। মহাত্মাজীর চিত্তশুদ্ধি বোধকরি

এই উপবাসে সম্যক্ ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকিবে; কিন্তু হিন্দুভারতের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই।

কথাপ্রসঙ্গে অনেক পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ আসিয়া পড়িল। এখন মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের ধারা পুনরায় অনুসরণ করা যাউক।

কলিকাতা কংগ্রেসে ত প্রায় সমস্ত বড় বড় বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতাদিগের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও খিলাফতের চেলাদের সাহায্যে গান্ধী ভোটে জয় লাভ করিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় জয় তাঁহার হইল তখন, যখন যাঁহারা কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মাজীর নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বপ্রভাবে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন, মতিলাল ও লাজপত প্রধান। তাঁহারা একেবারেই গান্ধীর lieutenant বনিয়া গেলেন এবং সম্পূর্ণরূপেই গান্ধী-আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইঁহারা council নির্ব্বাচনে যোগদান করিলেন না। পরন্তু সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় যে সমস্ত মনস্বী ও দূরদর্শী নেতা গান্ধীর magic-এ নিজেদের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি বিসর্জ্জন না দিয়া নূতন শাসনযন্ত্র capture করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, তাঁহাদিগকে ইঁহারা traitor আখ্যায় ভূষিত করিতে লাগিলেন, এবং গান্ধীর চেলাদিগকে ইঁহাদের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিলেন।

নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এবং হাইকোর্টে practice ছাড়িয়া দিয়া দাস মহাশয় গোলদীঘীর "গোলামখানা" হইতে দলে দলে ছেলে বাহির করিতে লাগিলেন। ছেলের দল তখন নেতাদের আজ্ঞায় পঠনেচ্ছু ছাত্রদিগের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে চীৎ হইয়া থাকিতে লাগিল—এইভাবে horizontal non-co-operation চলিল কিছুকাল। মোটামুটি কয়েকমাস ধরিয়া দেশময় হৈ চৈ সোরগোল বিশৃঙ্খলা চলিতে লাগিল।

একদিকে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব, ছাত্রদলকে ক্ষেপানো, মডারেটদিগকে গালাগালি, দৈনন্দিন হরতালে দোকানপাট বন্ধ করা, ইত্যাদি, আর অপরদিকে ইস্‌লামী খিলাফৎ-ওয়ালাদিগের প্রচণ্ড হুঙ্কার—এই সমস্ত মিলিয়া একটা অরাজকতার সৃষ্টি হইল বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ইহারই মধ্যে একদিন মহাত্মাজীর আপ্তবাক্য ঘোষিত হইল—Swaraj by the 31st December—গান্ধীভক্তের দল পুলকে শিহরিয়া উঠিল। পরম পরিতাপের বিষয়, সেই আর্ষ ঘোষণার পর কত 31st December কালগর্ভে বিলীন হইল, স্বরাজের সাক্ষাৎ কিন্তু অদ্যাপি মিলিল না।

দেশময় মহাত্মাজীর magic যখন এই প্রকার ভেল্কী খেলিতেছে, তখন বড়লাট লর্ড রেডিং শুধু ভাবিতেছেন, ব্যাপারটা কি হইল? কতদূর ইহার শ্রাদ্ধ গড়াইবে? আর সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর repression-ও চালাইতেছেন, জেলে বিস্তর লোক গিয়া ভর্ত্তি হইতেছে—আবার মাঝে মাঝে গান্ধীজীর সঙ্গে বাৎ-চিৎও হইতেছে। হঠাৎ লাটসাহেবের মাথায় এক বুদ্ধি খেলিল—Prince of Wales-কে ভারতবর্ষে লইয়া আসা যাউক; তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজভক্তির বন্যায় এই সমস্ত গোলমাল ভাসিয়া যাইবে। যুবরাজের কোন প্রকার অসম্মান হইবে না এই প্রকার আশ্বাস দিয়া বিলাতের মন্ত্রিসভাকে এবিষয়ে সম্মত করিলেন। এদেশে পদার্পণমাত্রই কিন্তু আগুন জ্বলিয়া উঠিল—এতদিনের সযত্নসন্ধুক্ষিত ব্রিটিশ-বিদ্বেষ-বহ্নিকে শীতল অহিংসাবারির প্রক্ষেপে আর প্রশমিত রাখিতে পারিল না—বোম্বাই সহরে ভীষণ দাঙ্গা সুরু হইল। দাঙ্গার বহর দেখিয়া গান্ধী মহারাজ ভড়কাইয়া গেলেন, বলিলেন, Swaraj is stinking in my nostrils; আর প্রয়োগ করিলেন তাঁহার চিত্তশুদ্ধির patent ঔষধ—এক সপ্তাহের উপবাস।

উপবাস নির্ব্বিঘ্নে উদ্‌যাপিত হইল। যুবরাজও ভারতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পুলিশ ও মিলিটারী পরিবেষ্টিত হইয়া যাতায়াত করিতে

লাগিলেন, আর প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি বয়কট ও হরতাল দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। বড়লাট রেডিং পড়িলেন মহা ফাঁপরে। অহিংস অসহযোগের দাপটে ব্রিটিশ রাজ্য যে টলমল করিতেছিল তাহা মোটেই নহে, তাহার শক্তি পূরা মাত্রাতেই অক্ষুণ্ণ ছিল, কারণ শুধু চীৎকারে ও জেল-ভর্ত্তিতে কামান বন্দুক সঙ্গীন উড়িয়া যায় না—কিন্তু যুবরাজ ভারতে আসিলে তাঁহার কোন অসম্মান হইবে না এই আশ্বাসের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়া কার্য্যতঃ তাঁহাকে ঘোরতর অসম্মান ও অপমানের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন, ইহা ভাবিয়া লর্ড রেডিং নিজে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন এবং নিজেকে personally compromised মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন মনে হইল, এ যাবৎ যাহা অপমান হইবার তাহা ত হইয়াছে তবুও যদি শেষটা যুবরাজকে অপমানের হাত হইতে বাঁচানো যায়। তাই যুবরাজের কলিকাতায় পদার্পণের প্রাক্কালে লর্ড রেডিং নিজে কলিকাতায় আসিলেন, বলিলেন যে তিনি একেবারে puzzled and perplexed হইয়া পড়িয়াছেন, এবং প্রস্তাব করিলেন যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হউক, কংগ্রেস তরফ হইতে হরতাল বয়কট ইত্যাদি বন্ধ করা হউক, সরকার পক্ষ হইতে তিনিও সমস্ত অসহযোগী বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তাছাড়া, আন্দোলন প্রশমিত করিবার নিমিত্ত সরকারকর্ত্তৃক যে দমননীতি অনুসৃত হইতেছিল তাহাও প্রত্যাহার করিতে তিনি অঙ্গীকার করিলেন; এবং উভয়পক্ষের এই বিসংবাদ শান্ত হওয়া মাত্র, শাসন-সংস্কার আরও কিছু অগ্রসর করা যায় কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য Round Table Conference পর্য্যন্ত offer করিলেন, এবং ইহাও বলিলেন যে সেই Conference-এ উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধিগণ তুল্যাসনে বসিবে, and no party will be able to claim victory or defeat।

বড়লাটের এই প্রস্তাবে দেশময় একটা বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইল, একটা সম্মানজনক মীমাংসার সম্ভাবনায় দেশবাসী উৎফুল্ল হইল, এমনকি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতারা—যাঁহারা গান্ধী-নীতির অনুসরণ করিয়া তখন কারাগারে ছিলেন—তাঁহারা পর্য্যন্ত এবম্প্রকার সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য উন্মুখ হইলেন। দেশের লোক কেবল উদ্গ্রীব হইয়া রহিল মহাত্মাজী এই প্রস্তাবে সম্মত হন কিনা জানিবার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, কোন নিষ্পত্তিতে কোন Round Table Conference-এ যোগদান করিতেই রাজী হইলেন না। সমগ্র ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হইয়া গেল মহাত্মাজীর এবংবিধ আচরণে। আর এই অভাবনীয় আচরণের কারণ তিনি কি দর্শাইলেন? না, তিনি শুধু অসহযোগ আন্দোলনের বন্দীদিগের মুক্তিতে সন্তুষ্ট নহেন; খিলাফতের আসামী করাচীর বন্দী মহম্মদ আলিপ্রমুখ ইস্‌লামী নেতাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—নচেৎ তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার আপোষ করিতে পারেন না এবং তাঁহার আন্দোলনও স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত নহেন। পুনরায় ইস্‌লামের দরগায় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বলিদান হইল—এবং সেই বলিদানের পুরোহিত হইলেন হিন্দুনেতা মহাত্মা গান্ধী।

গান্ধীর এই অন্যায় আবদারে লর্ড রেডিং রাজী হইলেন না। পরন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। পণ্ডিত মালবীয় প্রমুখ দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ আর একবার বড়লাটের নিকট এই বিষয়ে দৌত্য করিতে গেলেন, কিন্তু গান্ধীর এই attitude-এর পর তাঁহাদের কিছু বলিবার আর মুখ রহিল না। যুবরাজ কলিকাতা আসিলেন, যথারীতি হরতাল ইত্যাদি দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন, তারপর আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া কিছুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্নতির একটা সুবর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষ হারাইল—হিন্দু নেতৃত্বের দোষে। দুই বৎসর পরে, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—তখন মহাত্মার magic-এর মোহ তাঁহার বহুল পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে—আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,

The Mahatma bungled and mismanaged। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

যাহা হউক, কোন প্রকার সন্ধি আপোষ করিতে মহাত্মাজী যখন রাজী হইলেনই না, পরন্তু হুঙ্কার করিতে লাগিলেন যে তিনি অবিলম্বে তাঁহার প্রিয় বার্দ্দোলি তালুকায় civil disobedience সুরু করিবেন, তখন অন্ততঃ অনেকের এই কৌতূহল হইল যে, আচ্ছা, এই নূতন রকম লড়াইটাই দেখা যাউক না। এত বড় সুবিধা সুযোগ পাইয়াও মহাত্মাজী যখন প্রবলপ্রতাপান্বিত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহার ঝুলিতে একটা অসাধারণ রকম কোন অস্ত্র থাকিবে যাহার প্রয়োগে তিনি একেবারে কেল্লা ফতে করিয়া দিবেন। তা সেই ব্যাপারটাই একবার পরখ্ করা যাউক না—হয় এস্পার নয় ওস্পার।

গান্ধীর বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধিলেন। বার্দ্দোলির প্রচণ্ড অহিংস অভিযান অনেক বিজ্ঞাপনের ঘটার পর যখন বাহির হইবে হইবে, এমন সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটিল। আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরা নামক এক নগণ্য থানাতে অহিংস কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারেরা এক দাঙ্গা করিয়া বসিল, এবং শুধু দাঙ্গা নয়, সেখানকার থানাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া তথাকার পুলিশদিগকে জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ করিল। এই হিংস্র বর্ব্বরতায় দেশ শিহরিয়া উঠিল, মহাত্মা গান্ধী ত তাঁহার অহিংস বিদ্বেষমন্ত্রের এই নৃশংস অভিব্যক্তি দেখিয়া একেবারে আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন আর আন্দোলন চালানো safe নয়—ভারত-উদ্ধার কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকুক—এবং যে বার্দ্দোলিতে অহিংস সমরের নূতন এক সংস্করণ প্রকটিত হইবার কথা ছিল, সেই বার্দ্দোলি হইতেই সমগ্র অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিবার ফতোয়া বাহির হইল। এই strategic retreat হইল ১৯২২এর ফেব্রুয়ারী মাসে;

ততদিনে যুবরাজ দেশে চলিয়া গিয়াছেন, বড়লাট রেডিংএর দুশ্চিন্তার কারণ অন্তর্হিত হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তরফে কোন বাধ্যবাধকতা তখন আর নাই। আন্দোলন সেই প্রত্যাহার করিতেই মহাত্মা বাধ্য হইলেন, অথচ দুই মাস পূর্ব্বে এই প্রত্যাহারটি করিলে কত বড় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারিত! মহাত্মার কি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি!

দেশের উদ্ধার অপেক্ষা তাঁহার অহিংস সত্যাগ্রহমন্ত্রের বিশুদ্ধিরক্ষাকেই যখন তিনি বড় বলিয়া স্থির করিলেন, এবং নিজের বিশিষ্ট অস্ত্র যখন নিজেই সংবরণ করিলেন, এবং দেশবাসী যখন হতবুদ্ধি হইয়া গেল কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, তখন গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন মহা সুযোগ। বিনা বাক্যব্যয়ে রাজদ্রোহ অভিযোগে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। যে গান্ধীর গ্রেপ্তারে তিন বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রায় বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আজ সেই গান্ধীরই গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দেশে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত হইল না। দুইবৎসরব্যাপী গান্ধী আন্দোলনে ভারতের তেজ বীর্য্য একেবারে soul-force-এ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল কিনা তাই। অথচ গান্ধীভক্তগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে মহাত্মাজীর কল্যাণে যে রকম mass-awakening হইয়াছে, এরকমটি আর কদাপি দেখা যায় নাই। Awakening-ই বটে!

গান্ধী ত জেলে চলিয়া গেলেন, এবং তথায় গিয়া model prisoner বা আদর্শ বন্দীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আর mass-awakening এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের কি হইল? একেবারে ঠাণ্ডা, যাহাকে ইংরাজীতে বলে fizzled out। যে আন্দোলনের পশ্চাতে জনসাধারণের হৃদয়ের কোন প্রকৃত প্রেরণা নাই, শুধু একজন মাত্র লোকের ব্যক্তিত্বের মোহ ও নামের magic-এর উপর যে আন্দোলনের নির্ভর, তাহার পরিণতি এইরূপই হইয়া থাকে।

কাউন্সিল প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, ইস্কুল কলেজ হইতে যুবকদিগকে টানিয়া আনিয়া জেলে প্রেরণ করিয়া, বিলাতী যুবরাজকে সাড়ম্বরে বয়কট করিয়া, খিলাফৎ ভলাণ্টিয়ারের দল ও মোল্লা মৌলবীর দল দ্বারা ইস্‌লামী fanaticism দেশময় ছড়াইয়া, তাহারই ফলে দক্ষিণভারতে উত্তেজিত অশিক্ষিত মুসলমান মোপ্‌লাদিগের দ্বারা হিন্দুদিগকে অকথ্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া, বড়লাটের আপোষ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, এবং অবশেষে অহিংস আন্দোলনে হিংসার বীজাণু সহসা আবিষ্কারকরতঃ নিজের Himalayan blunder হইয়াছে কবুল করিয়া যখন মহাত্মাজী নির্ব্বিঘ্নে ইয়ারোদা জেলের অভ্যন্তরে উপনীত হইলেন, তাহারই কিছুদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনপ্রমুখ নেতৃগণ জেল হইতে বাহির হইলেন, এবং বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ। তখন আর কি করেন? নাগপুরে গান্ধীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা কোন প্রকারে শোধরানো যায় কিনা, তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।

ইহার পরের দুই বৎসরের ইতিহাস আর বিস্তৃত করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই চলিবে যে অনেক কষ্ট করিয়া দেশবন্ধু কংগ্রেসকে গান্ধী-নীতি হইতে সরাইয়া আনিলেন, পণ্ডিত মতিলাল ও পরে লালা লাজপত রায়ও তাঁহার সাহচর্য্য করিলেন, এবং কাউন্সিল বয়কট করা যে গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল তাহা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া স্বরাজ্যপার্টি গঠন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে গান্ধীও গুরুতর অসুখের ব্যপদেশে কারামুক্ত হইলেন; এবং প্রথম প্রথম পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন চালাইবার হুম্‌কি দেখাইলেও, পরে দেশবন্ধুর স্বরাজ্যপার্টিরই ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিলেন—মহাত্মাজীর নিজের ভাষায়, like a child pathetic-

ally clinging unto the mother's breast; এবং তৎপরে political আম্‌মোক্তারনামা স্বরাজ্যপার্টিকে লিখিয়া পড়িয়া দিয়া নিজে political life হইতে retire করিয়া সবরমতীর গুহাতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার আদি ও অকৃত্রিম ভক্তসম্প্রদায়, যাহারা তখন no-changer বলিয়া পরিচিত ছিল—তাহারা অকূলে ভাসিল। বলা বাহুল্য, দেশবন্ধুর জীবদ্দশায় মহাত্মাজী আর সেই গুহা হইতে নিঃসৃত হইতে ভরসা পান নাই।

কিন্তু এদিকে দেশবন্ধুগঠিত নব স্বরাজ্যসম্প্রদায়ই কি কম ঝক্‌মারিতে পড়িলেন? প্রাক্তন কর্ম্মফল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যে কাউন্সিলে যাওয়া দেশদ্রোহিতার চরম নিদর্শন বলিয়া তাঁহারা এ কয় বৎসর চীৎকার করিয়াছিলেন, যাহার জন্য সর্ব্বজনবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় দেশনেতাকেও লাঞ্ছিত করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন নাই—সেই ঘৃণিত জঘন্য কাউন্সিলে কি বলিয়া ঢোকা যায়? Formula চাই। Formula ঠিক হইল, Reforms work করিতে যাইতেছি না, Reforms wreck করিব—মন্ত্রিমণ্ডল ধ্বংস করিব, গভর্ণমেণ্ট যে কোন প্রস্তাব আনয়ন করিবেন—good, bad, indifferent—সমস্তই oppose করিব, ইত্যাদি। আমরা non-co-operator সাঁচ্চাই আছি, তবে এবার আর বাহির হইতে অসহযোগ নহে, একেবারে citadel of the bureaucracy-তে ঢুকিয়া non-co-operation from within। অতএব আমাদের দেশভক্তিতে কেহ সন্দেহ করিও না। স্থির হইল কাউন্সিলে গেলে দেশদ্রোহিতা হয় না, office লইলেই দেশদ্রোহিতা হয়। কিছুদিন পরে ফতোয়া বাহির হইল, সভাপতির office লইলে দোষ নাই, কিন্তু মন্ত্রিত্বগ্রহণে দেশদ্রোহিতা অমার্জ্জনীয়।

এইরকম হাস্যাস্পদ প্রোগ্রামের absurdity দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় লোকে বুঝেন নাই তাহা নহে; কিন্তু উপায় কি? অসহযোগের

কর্ম্মচক্রে যে আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই non-co-operation-এর নেতি নেতি বুলি অন্ততঃ মুখে না আওড়াইয়া উপায়ান্তর নাই—নহিলে যে ঘৃণিত মডারেটদিগের সঙ্গে আর কোন প্রভেদ রক্ষা করা যায় না। যাহা হউক, এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়া অনিষ্ট হইল দ্বিবিধ। একে ত নিজেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক শাসনযন্ত্রকে করায়ত্ত না করাতে নিজদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইলই; অপরন্তু আর এক ঘোরতর অনিষ্টের ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে মন্ত্রিদল সংহার করিতে হইলে, Dyarchy অচল করিতে হইলে দলপুষ্টি করা চাই—non-co-operation-পন্থী কাউন্সিলওয়ালা ত খুব বেশী সংখ্যক নহে, majority ত নহেই—স্বতরাং মুসলমানদিগকে হাত করা চাই। কি প্রকারে? তাহাদিগকে অনেক কিছু স্ববিধা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া। অতএব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উদ্ভাবন করিলেন আর এক দফা pact—ইহাই বিখ্যাত Bengal Hindu-Moslem Pact—খাঁ বাহাদুর আবদুল করিম সাহেব dictate করিলেন, দাস সাহেব ditto দিলেন। লক্ষ্ণৌতে যে বিষবৃক্ষটি উপ্ত হইয়াছিল, এবং মহাত্মাজীর কল্যাণে খিলাফৎ-বারি সেচনে যাহা সযত্নে সংবৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা দেশবন্ধু মহাশয় Dyarchy ধ্বংসের ধান্দায় পড়িয়া ফলে ফুলে পল্লবিত করিয়া তুলিলেন। হিন্দুনেতা দ্বারাই হিন্দুর তথা সমগ্র জাতির আত্মহত্যার পথ আর একটু প্রশস্ত করা হইল।

দেশবন্ধু দাশ স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহার pact-এর দলিলখানি—যাহা ratify করাইবার জন্য তিনি কোকনদ কংগ্রেসে এবং সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে কি চেষ্টাই না করিয়াছিলেন—সে দলিল হয় ত আজ scrap of paper-এ পরিণত হইয়াছে; কিন্তু সেই চুক্তির ফলে আজও বাঙ্গালাদেশ হাবুডুবু খাইতেছে।

আজ ম্যাকডোনাল্ডের award-এর আমরা শতমুখে নিন্দা করিতেছি; কিন্তু দেশবন্ধুর সেই pact-এ মুসলমানগণের শতকরা ৫৫টি seat-এর ব্যবস্থা হইয়াছিল separate electorate-এর basis-এ, এবং চাকুরীর বাজারেও বণ্টন-ব্যবস্থা হইয়াছিল উক্ত হারে, এবং যে পর্য্যন্ত না উক্ত হারে মুসলমানসংখ্যা পৌঁছায় ততদিন শতকরা ৮০টা চাকুরী মুসলমানদিগকে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তদপেক্ষা বেশী কিছু মুসলমানদিগকে দিয়া ফেলেন নাই। এবং গত বৎসর Round Table Conference-এর দ্বিতীয় দফাতে গান্ধীজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মুসলমানদিগের নিকট হইতে united demand-এর প্রতিশ্রুতি পাইবার আশায় বাঙ্গালায় ও পঞ্জাবে separate electorate-এর basis-এ মুসলমানদিগকে সমগ্র কাউন্সিলে শতকরা ৫১টি seat দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইহার পরে হিন্দুর পক্ষে বলিবার আর কি আছে? হিন্দু নেতৃত্বের এই অদূরদর্শিতা, এই আত্মঘাতপরায়ণতা, এই defeatism-এর দৃষ্টান্ত কি মোটে দুই একটি? বিগত বিশ বৎসরের ঘটনাপরম্পরায় ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে।

যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম। গান্ধী মহারাজের সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ ত গুহাহিত হইয়া রহিল, দেশবন্ধুর Dyarchy ধ্বংসের আড়ম্বরই আসর জমাইয়া রহিল, মাঝে মাঝে walk-out walk-in প্রভৃতির অভিনয়ও চলিতে লাগিল, হিন্দুনেতাদের খোসামোদের দৌলতে মুসলমানদিগের পায়া ক্রমশঃই ভারী হইতে লাগিল, আসলে দেশের কাজ কিছুই অগ্রসর হইলনা। দেখিতে দেখিতে Montagu Reforms-এর দশ-শালা revision-এর সময় আসন্ন হইল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসর পূর্ণ হইবার কথা; কিন্তু তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই লর্ড বার্কেনহেড Statutory Commission ঘোষণা করিলেন—এবং তাহাতে সব মেম্বরই

পার্লামেণ্টের সভ্যমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। কালা আদমী Commission-এ থাকিবেনা এই কথাতে নরম গরম দুই দলই বেজায় গোঁসা করিলেন। স্থির হইল এই কমিশন বয়কট করিতে হইবে, এবং ইহার সভাপতি Sir John Simon সাহেবকে Go back Simon রবে সশব্দে অভিনন্দিত করিতে হইবে।

অথচ কমিশনে মুসলমান সভ্য না থাকা সত্ত্বেও মুসলমান মহলে বড় একটা অভিমান কি চাঞ্চল্য দেখা গেল না—তাঁহারা বিধিমত সেই কমিশনের সমক্ষে তাঁহাদের দাবীদাওয়া আঠার আনা পেশ করিবার জন্য লাগিয়া গেলেন। সেই দাবীদাওয়াগুলিকে সুসংহত ভাবে বিন্যস্ত করিয়া মুসলমান নেতা জিন্না সাহেব প্রেসিডেণ্ট উইলসনের দেখাদেখি fourteen points-এ পরিণত করিলেন। এই সুবিখ্যাত চতুর্দ্দশপদীর ভিতরে Sind separation হইতে আরম্ভ করিয়া দাস সাহেবের Bengal Pact-এর অনুরূপ ধারাগুলি পর্য্যন্ত যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হইল। আর সেই প্রচণ্ড খিলাফতী নেতা আলিভ্রাতারা—যাঁহাদের জন্য ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গান্ধী মহারাজ ভারতের স্বার্থ বলি দিয়াছিলেন—তাঁহারা তখন কোথায়? তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরই বুদ্ধিমানের ন্যায় বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহারা কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সাইমন কমিশন ত আসিল, হিন্দুনেতা ও তাহাদের চেলাদের দ্বারা কৃষ্ণপতাকাসহযোগে অভ্যর্থিত হইয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং তারপরে কার্য্যসমাধান্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। কোন বড়দরের হিন্দু নেতা বা হিন্দু দল সাক্ষ্য প্রভৃতি বিশেষ দিলেন না। কমিশনের সমক্ষে হিন্দুর অভাব অভিযোগ, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা একরকম অপ্রকাশই রহিয়া গেল।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসমহলে কিছু ঘটনা ঘটিল। পণ্ডিত মতিলালের ছেলে জাহির পণ্ডিত কিছুদিন ধরিয়া মহা হৈ চৈ লাগাইয়া দিলেন। সঙ্গে

সঙ্গে পোঁ ধরিলেন আমাদের বাঙ্গালার অকালপক্ক নেতা শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র। তাঁহাদের আর কিছুতেই Dominion Status-এ পেট ভরিতে ছিলনা, একেবারে Complete Independence-এর জন্য জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছিল—আমরা প্রায় স্বরাজের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি কিনা, তাই পূর্ণগ্রাসের জন্য এত লালসা! না হইবে কেন? ১৯২৮এর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে কংগ্রেস বসিল—সাইমন কমিশন ততদিনে একদফা ভারতভ্রমণ সারিয়া গিয়াছেন এবং জাহিরলালের পিতা মতিলাল তাঁহার Nehru Report প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের জন্য জাহির সুভাষ বিস্তর ঝুলাঝুলি করিলেন। গান্ধী মহাত্মা তাঁহার বনবাস-অন্তে আবার কংগ্রেসে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন; এই অবস্থায় অতটা বাড়াবাড়ি তাঁহারও ভাল লাগিল না, তাই তিনি ও বুড়া মতিলাল মিলিয়া তরুণ-অভিযানকে অনেক কষ্টে থামাইয়া রাখিলেন, এবং এই সর্ত্তে রফা করিলেন যে যদি আর একবৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট Dominion Status দেন তবেই তাহা গ্রহণ করা হইবে, আর যদি এক বৎসরের মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে একেবারে পূর্ণ স্বরাজ! ব্রিটিশ রাজকে ultimatum দেওয়া হইল। স্বরাজ-সমস্যার সমাধান কেমন জলের মত সহজ হইয়া গেল!

বড়লাট তখন লর্ড আরুইন। নেহাৎ গোবেচারী, ধর্ম্মভীরু, আদর্শবাদী লোক। ক্ষত্রিয়ের আসনে যেন ব্রাহ্মণ আসিয়া বসিয়াছেন। বিলাতেও তখন শ্রমিকদল রাজত্ব করিতেছে—ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী, ওয়েজ্উড বেন্ ভারতসচিব। ভারতের পক্ষে যোগাযোগ শুভই বলিতে হইবে। এত চেঁচামেচি গণ্ডগোল দেখিয়া লর্ড আরুইন ঠিক করিলেন একবার স্বয়ং বিলাত যাইয়া বড় বড় কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া Dominion Status সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা assurance আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি তাহাই করিলেন,

এবং চারি মাস বিলাতে থাকিয়া সবিশেষ চেষ্টা করিয়া ভারতে ফিরিয়াই ১৯২৯এর ১লা নভেম্বর তারিখে Dominion Status-এর প্রতিশ্রুতি এবং Round Table Conference-এর ঘোষণা করিলেন।

কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের উপরে এই ঘোষণার ফল হইল অপ্রত্যাশিত। তাঁহারা ভাবিলেন, বড়লাট যখন এতটা করিতেছেন আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তখন ত ব্রিটিশরাজকে বেজায় কাবু করিয়াই আনিয়াছি! নিশ্চয়ই আর একটু চাপ দিলে আরও অনেক কিছু আদায় করা যাইবে। গান্ধী ও তস্য চেলাদিগের temperature কাজেই অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে চোখ রাঙ্গাইয়া তাঁহারা বলিলেন, Dominion Status দিবে ত বাপু এখনই দেও। এই Round Table Conference-এই উহা চাই। বড়লাট আরুইন নেহাৎ বিপন্ন ভাবে বলিলেন, এবারকার Conference-এই উহা হইবে কিনা আমি কেমন করিয়া বলিব? তবে তোমরা সেখানে গিয়া তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পার। তখন নেতৃগণ গরম হইয়া বলিলেন, বটে, এই কথা? তোমার Dominion Status হাম্ নেহি মাংতা, তোমার Round Table Conference-কেও আমরা থোড়াই কেয়ার করি, আমরা এই দণ্ডেই চলিলাম লাহোরে—তথায় এখনই স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করিব—ইন্‌খিলাপ্ জিন্দাবাদ্।

যেই কথা সেই কাজ। লাহোর কংগ্রেসে জাহির পণ্ডিতের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পতাকা—Union Jack—ভস্মসাৎ করা হইল, Nehru Report-কে ইরাবতীবক্ষে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল, পূর্ণ স্বরাজই কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল, এমনকি স্বাধীনতার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই আমেরিকার 4th July-এর দেখাদেখি স্বাধীনতা-দিবস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়া গেল। অর্থাৎ কাগজে কলমে

যতদূর করা যায় ঠিক লেফাফা দোরস্ত মাফিক সবই সম্পন্ন হইল। ঢাল নাই তরোয়াল নাই একেবারে নিধিরাম সর্দ্দার।

তারপর, এই সব আড়ম্বর সমস্ত হইয়া যাইবার পর, মহাত্মা গান্ধী ভাবিতে বসিলেন, তাই ত, সব ত হইল, পূর্ণ স্বরাজ পর্য্যন্ত ত ঘোষণা হইল, ততঃ কিম্? এখন করা যায় কি? অনেক গবেষণার পরে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে স্বাধীনতার নিদর্শনস্বরূপ একটা কিছু ত করিতে হইবে, কোন একটা আইন ত অমান্য করিতে হইবে; তবে আপাততঃ লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া সমুদ্র-তীরে গিয়া লোণাজল জ্বাল দেওয়া যাউক। স্বরাজলাভের এত বড় একটা অব্যর্থ হদিস্ পাইয়া গান্ধীভক্তগণ একেবারে মাতিয়া গেল—যদিও দশ বৎসর পূর্ব্বে এই রকমই আর একটা অব্যর্থ হদিস্ মহাত্মাজী তাহাদিগকে বাত্লাইয়াছিলেন—চরকা—তাহার তন্তুজালে কিন্তু স্বরাজবিহঙ্গম সেবার ধরা পড়ে নাই।

যাহা হউক এই প্রকারে কিছুদিন Civil Disobedience চলিতে লাগিল এবং দলে দলে লোক গান্ধী এবং তাঁহার চেলাদের প্ররোচনায় জেলে যাইতে লাগিল। প্রথম Round Table Conference কংগ্রেসের patriot-দিগের অনুপস্থিতিতেই চলিতে লাগিল। তথায় হিন্দুদিগের মধ্যে মডারেটরাই শুধু গেলেন—মুসলমান কিন্তু সব দলই তথায় হাজির। সেখানে মোটামুটি একটা শাসনপদ্ধতির খসড়া খাড়া করিয়া সাপ্রুপ্রমুখ মডারেট নেতৃগণ ম্যাকডোনাল্ডকে ধরিয়া পড়িলেন, বলিলেন, দোহাই প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, এবার গান্ধীর দলকে ছাড়িয়া দেও, এখন নিশ্চয়ই তাহাদের সুবুদ্ধি হইবে, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে রাজী হইবে। তাঁহাদের কথাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসওয়ালাদের ছাড়িয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, বড়লাট আরুইন গান্ধীকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে একটা আপোষ রফা করিলেন—উদ্দেশ্য, যাহাতে পরের Round Table-এ তিনি

গিয়া বসেন এবং যাহা হউক একটা সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা হয়। ইহাই বিখ্যাত Irwin-Gandhi Pact; ইহারই ফলে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিলে গেলেন।

এই Pact-এর প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে এই কথাটাই লক্ষ্য করিবার যে যখনই ভারতীয় হিন্দুনেতারা কোন reasonable compromise-এর জন্য চেষ্টা করিয়াছেন অথবা তাহাতে সম্মত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই; কিংবা তখন মুসলমানকে ডাকিয়াও সলাপরামর্শ করেন নাই। লর্ড রেডিংএর ১৯২১এর offer ইহার এক নিদর্শন; এবং ১৯৩১এর লর্ড আরুইনের Pact তাহার অপর নিদর্শন। সত্যের খাতিরে ইহা বলা আবশ্যক। আজ যে ক্রমেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মুসলমান ও অন্যান্য reactionary element-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন, ইহার একমাত্র কারণ, মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, হিন্দু নেতৃগণের irreconcilable attitude—ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

কিন্তু Irwin-Gandhi Pact-এর ফল হইল অদ্ভুত। মডারেট দিগের সুপারিশে এবং গভর্ণমেণ্টের কৃপায় জেল হইতে খালাস পাইয়া কংগ্রেসী হিন্দু নেতাদিগের ও তাহাদের চেলাদিগের আস্ফালন দেখে কে? বল্লভ সর্দ্দারের হুঙ্কারে, জাহিরলালের আস্ফালনে, সুভাষ বসুর দাপটে ভারতবক্ষ টলমল করিতে লাগিল। মনে প্রতীতি হইতে লাগিল বুঝিবা ইহারা একটা পাণিপথ বা ওয়াটার্লু ই বিজয় করিয়া বসিয়াছে। বিলাতে গিয়া গান্ধী মহারাজ গরম গরম বুলি ঝাড়িতে লাগিলেন, নয়া দিল্লীতে হাঁসপাতাল বসাইবেন, পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে সমস্ত জায়গীর জমিদারীর স্বত্বের তদন্ত করিবেন, সেনাবিভাগ control করিবেন, আরও কত কি? এদেশে বসিয়া সেনগুপ্ত সাহেব জল্পনা করিতে লাগিলেন, কতদিনে ব্রিটিশবাহিনীকে আরবসাগরে

নিমজ্জিত করিবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সময় বুঝিয়া হিন্দুনেতাদিগের উদ্‌গারিত ব্রিটিশবিদ্বেষবহ্নির যে cannon-fodder, অর্থাৎ বিপথে চালিত হিন্দু যুবকবৃন্দ, তাহাদের মধ্য হইতে বিস্তর terrorist বাহির হইতে লাগিল, পঞ্জাবের ভকত সিং হইতে বাঙ্গালার দীনেশ গুপ্ত পর্য্যন্ত ভীষণ হত্যাপরাধে লিপ্ত হইল, কংগ্রেসী মহলে তাহাদের বাহবারও অবধি রহিল না। এইভাবে কিছুকাল লম্ফঝম্প চলিল।

ওদিকে Irwin-Gandhi Pact-এর কিছু পরেই বড়লাট পরিবর্ত্তন হইল, লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে বিলাতেও শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হইল ও রক্ষণশীলপ্রধান National Government স্থাপিত হইল, এবং সরকার নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ১৯৩১এর শেষভাগে বাঙ্গালায় terrorism দমনের জন্য, যুক্তপ্রদেশে জাহিরলালের no-rent campaign নিবারণ করিবার জন্য ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে Red Shirt-দিগের উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য নূতন নূতন Ordinance জারি হইতে লাগিল। দ্বিতীয় গোলটেবিল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধী এই সব কড়া শাসনের সম্বন্ধে যেই কিঞ্চিৎ ভণিতা আরম্ভ করিলেন, অমনি অবিলম্বে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। এবং তাঁহার civil disobedience আরম্ভ করিবার পুনঃপ্রচেষ্টা একেবারে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। তাই সেদিন আরুইন লাটের আমলে যাঁহাদের স্পর্দ্ধা ও আস্ফালনে দেশে টেঁকা দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ স্যামুয়েল হোর-উইলিংডনের দৃপ্ত শাসনে সেই সব দুর্দ্ধর্ষ নেতা ও তাঁহাদের চেলাবর্গ চিঁ চিঁ করিতেছেন। কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সেই যে প্রচণ্ড অহমিকা যে তাঁহারাই একমাত্র সমর্থ to deliver the goods —সেই delivery ত এক্ষণে একেবারে abortion-এ পরিণত হইয়াছে।

অক্ষমের বাহ্বাস্ফোট আর কাহাকে বলে? আন্দোলনের পশ্চাতে কোন জোর কোন sanction কোন বাহুবল নাই, এমন কি আন্দো-

লনের প্রসার ও স্থায়িত্ব পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের forbearance-এর উপর নির্ভর করে, অথচ মুখের দাপট কি? নিজেদের কতটা শক্তি কতটা সামর্থ্য তাহার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র নাই, সম্বল শুধু চীৎকার, শুধু দম্ভ, শুধু bluff and bluster। এভাবে কোন সংগ্রাম পরিচালিত হইলে যে ফল অবশ্যম্ভাবী সেই ফলই আমাদের হইয়াছে।

যদি গায়ের জোরে সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভবপর হয় ত সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহা যদি না সম্ভব হয়, তবে আপোষ নিষ্পত্তিতে আসিতেই হইবে। গান্ধী-আন্দোলনের তরঙ্গে যখন সমস্ত দেশ টলমল, তখন সেই তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বরিশাল Provincial Conference-এ যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অবিসংবাদিত সত্য—সে কথা এই যে যাহাদের একমাত্র অস্ত্র moral pressure, তাহাদের পক্ষে, Swaraj can only come by compromise and consultation।

আর এই কথায় লজ্জা পাইবারই বা কি আছে তাহাও ত বুঝিনা। রাজনীতিতে ত যুদ্ধই একমাত্র নীতি নহে। সন্ধিরও স্থান আছে। সাম-দান-ভেদ-দণ্ডের সমবায়েই ত রাজধর্ম্ম। আন্দোলন করিতে হইবে, জাতির চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মকর্ত্তৃত্ব ব্যাপকতরভাবে পূর্ণতরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রামও করিতে হইবে; আবার যখন দেখা যাইবে যে সেই আন্দোলনে সেই সংগ্রামে রাজশক্তি বিচলিত হইয়া একটা নিষ্পত্তির পথে অগ্রসর হইতেছে, তখন সেই সুযোগেরও সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক সন্ধির জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। শুধু fighting for fighting's sake কোন সমরসাধনারই লক্ষ্য নহে। আবার নিজেদের ওজন না বুঝিয়া কতগুলি impossible demands করিয়া নিজেদের শক্তিক্ষয় করিয়া আত্মহত্যা করাও কোন সুবিজ্ঞ সেনাপতির

লক্ষণ নহে। কিন্তু বিগত চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত পরিচালিত হইয়া জাতির আত্মহত্যার পথই প্রশস্ত করিয়াছে। শুধু এই বিবেচনার অভাবে, দেশ কাল পাত্র ও অবস্থার পর্য্যবেক্ষণের অভাবে, এবং রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানের অভাবেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও অমিত প্রভাব সত্ত্বেও বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী একটা বিরাট্ failure।

শুধু একা তিনি failure হইলেও ক্ষোভ ছিল না, হাজার হাজার লোক যে তাঁহার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া নানাভাবে কত নির্য্যাতন কত ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, তাহা ভাবিয়াও তত ক্ষোভ হয় না—কারণ সকল সংগ্রামেই এই প্রকার নির্য্যাতন ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আর যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য ক্ষোভ করিয়াই বা ফল কি? কিন্তু পরম ক্ষোভের বিষয় এই যে জাতীয় আন্দোলনের bad generalship এবং misguided leadership-এর প্রতিক্রিয়ায় দেশের ভাবী শাসনপদ্ধতি বিকৃত বিজাতীয়রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং জাতির সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদিগের implacable attitude-এ স্বভাবতঃই ইংরাজ আজ ভারতসাম্রাজ্যের অন্যান্য জাতি সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইংরাজ তাহাদের স্বার্থ যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসনভার দেশীয় লোকদিগের হস্তে অর্পণ করিতে ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে রাজি হইতেছে বটে, কারণ দেড়শত বৎসর এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়া রাজনৈতিক commonsense তাহাদের যথেষ্টই জন্মিয়াছে—কিন্তু তা বলিয়া তাহাদের এমন কোন দুরবস্থা হয় নাই যে টাকা কড়ি কাঁথা কম্বল সব ফেলিয়া দিয়া তাহাদের এখনই পলায়ন করিতে হইবে। এমত অবস্থায় তাহারা বুঝিতে চায় যে কি রকম লোকের হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হইতেছে। যদি তাহাদের

প্রতীতি হয় যে হিন্দুর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিবামাত্র তাহারা ইংরাজ-দিগকে lock, stock and barrel-শুদ্ধ বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইবে —এবং গরম গরম বক্তৃতা দ্বারা হিন্দু নেতারা তাহাদের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেন নাই—তাহা হইলে তাহারা কি পন্থা অবলম্বন করিবে? ভারতের অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়কে বলীয়ান্ করিয়া হিন্দুকে কোণঠেসা নির্ব্বীর্য্য ও পঙ্গু করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইবে। বিচক্ষণ প্রবল রাজনীতিজ্ঞ প্রতিপক্ষ মাত্রই তাহা করিয়া থাকে। ইংরাজও তাহাই করিয়াছে। দেশীয় রাজন্যবর্গ, যাহারা এখনও ইংরাজের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র—মুসলমানসমাজ, যাহারা জাতীয়ভাবে এখনও বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে নাই—অনুন্নত হিন্দুসম্প্রদায়, যাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ এখনও বিশেষ জাগরিত হয় নাই—এই সমস্ত element-কে mobilize করিয়া ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতিতে জাতীয়তাবাদী হিন্দু উচ্চশ্রেণীকে নির্ব্বিষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই প্রয়াসেরই প্রকট প্রকাশ আজকার এই communal award। একদিনের অবিবেচনার ফল ইহা নহে; বিগত চতুর্দ্দশ বৎসরের ব্রিটিশবিদ্বেষে ক্রোধান্ধ অপরিণামদর্শী হিন্দু নেতৃত্বের ইহা অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। তাই বলিতেছিলাম যে communal award-এর বর্ত্তমান আকারের জন্য হিন্দুর নেতৃত্ব পূরামাত্রায় দায়ী। কবি রামপ্রসাদের কথাই তাই কেবল মনে হয়:

দোষ কারো নয় ত গো মা।
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥

বস্তুতঃ বিগত চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া সকল হিন্দু leadership-ই—কি নরমপন্থী, কি গরমপন্থী, কি মডারেট, কি কংগ্রেসী—এই এক প্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, একদিকে অভিমান আবদার অহঙ্কারের অবধি নাই ইংরাজের সঙ্গে, অপরদিকে ত্যাগ বিসর্জ্জন আত্মসমর্পণ চাটু-কারিতার বিরাম নাই মুসলমানের সঙ্গে। ইহা এক অদ্ভুত প্রহেলিকা।

ইংরাজরা যতই নরম হইয়াছেন হিন্দু নেতারা ততই গরম হইয়াছেন, পরন্তু মুসলমানেরা যতই গরম হইয়াছেন হিন্দু নেতারা ততই নরম হইয়াছেন। মণ্টেগু সংস্কার, লর্ড রেডিংএর আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব, লর্ড আরুইনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা হিন্দু সহযোগিতা আকর্ষণ করিবার জন্য, সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল কংগ্রেসী হিন্দু নেতৃত্বের অভ্রভেদী অভিমানের বর্ম্মে ঠেকিয়া; অথচ, সেই একই সময়ে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, খিলাফতের খোসামুদি, দেশবন্ধুর প্যাক্ট, ইত্যাদি দ্বারা হিন্দু আত্মসমর্পণের অবধি রহিল না মুসলমানের নিকট। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

সাইমন কমিশনে ভারতীয় কেহ ছিল না বলিয়া "Go back Simon" আন্দোলন সুরু করা হইল—মডারেট নেতা সাপ্রূ হইতে কংগ্রেসী নেতা গান্ধী পর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট হিন্দু নেতাই কমিশনের বিশেষ সাহচর্য্য করিলেন না—কিন্তু মুসলমান নেতারা করিলেন। বৎসর দুই পরে সাইমন সাহেব যখন তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিলেন, তখনও মডারেট হইতে কংগ্রেসী পর্য্যন্ত সব নেতারাই—কেহ বলিলেন, উহা স্পর্শ করা পর্য্যন্ত মহাপাপ, একদম পুড়াইয়া ফেল; কেহ বলিলেন, উহা waste paper basket-এ ফেলিয়া দেও। আজ সেই সাইমন কমিশনের recommendation-গুলি বজায় থাকিলে কি রকম হইত? ভাষাহিসাবে প্রদেশগঠনের জন্য তাঁহাদের সেই Boundary Commission-এর নির্দ্দেশ, এই হিন্দুমুসলমান সমস্যায় Joint Electorate-এর অনুকূলে তাঁহাদের নির্দ্দেশ—এগুলি এখন কেমন লাগে? সাইমন রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা হইলে ত আজ communal award-এর চাপে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইত না। আজ ত এত গলাবাজি এত কান্নাকাটি করিয়াও ইহার একটি নির্দ্দেশেরও নাগাল পাওয়া যাইতেছে না। এই সাইমন কমিশনের recommendation যদি হিন্দুগণ সমর্থন করিতেন, তবে আজ আর মানভূম সিংহভূমের বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার বাহিরে পড়িয়া থাকিত না,

আর ভারতবর্ষের উপরে জিন্না সাহেবের fourteen points জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিতে পারিত না। কর্ম্মফল অথণ্ডনীয়।

এখন মুসলমানদিগের কর্ম্মপন্থা একটু আলোচনা করা যাউক। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ তাঁহাদের রাজনৈতিক status-এর কি অসামান্য উন্নতি সাধন করিয়াছেন দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হইতে পারে তাহাদের মধ্যে ভারতীয় জাতিত্ববোধ এখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই, কিন্তু ইস্‌লামের একত্ববোধও ত নেহাৎ কম কথা নয়। আজ যদি ইস্‌লামের একত্ববোধ জাগ্রৎ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমান ইংরাজ-প্রভুত্বের অন্তর্ধানের পর তাহার প্রাচীন বাদশাহী গৌরব বর্ত্তমান গণতন্ত্রের মধ্য দিয়াই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখে, তাহাতে তাহাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ দেখি না। Political domination বা রাজনৈতিক প্রভুত্ব করিবার লালসার জন্য যে কোন জাতির লজ্জা পাইতে হইবে জগতের সে অবস্থা এখনও আসে নাই। আর লজ্জার বিষয় হউক আর না-ই হউক, ইহা একটা fact যে এই রকম একটা আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সমাজের মধ্যে গজাইয়া উঠিয়াছে। তাহা চক্ষু বুজিয়া অস্বীকার করিয়া democracy আর nationalism-এর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই ত আর সে fact অন্তর্ধান করিবে না। হিন্দুর তাহা বুঝা উচিত।

বর্ত্তমান মুসলমানগণের আদর্শ স্পষ্ট, objective limited; মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে তাহারা ধাবমান হয় না, কর্ম্মপন্থা তাহারা বাস্তবের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই নির্দ্ধারণ করে, কোন্‌টা সম্ভব কোন্‌টা অসম্ভব সে বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি সজাগ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে কোন shibboleth-এর খাতিরে কোন formula-র মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তাহারা মরিতে প্রস্তুত নহে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতে তাহারা বাঁচিবে—এই দৃঢ়পণ হইতে কেহ তাহাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পরন্তু হিন্দুদিগের মনোবৃত্তি দেখিয়া মনে

হয় যে মরিতে তাহাদের বিশেষ আপত্তি নাই, যদি democracy-র বিশুদ্ধির খাতিরে তাহাদের মরণই আবশ্যক হয়। কিন্তু বস্তুতন্ত্রবাদী মুসলমান মোটেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নহে—এমন কি বিশুদ্ধ democracy-র খাতিরেও নহে। এমন যে "জাতীয়তাবাদী" মুসলমান ডাঃ আন্‌সারী, তিনি পর্য্যন্ত বলেন, বাঙ্গালাদেশে joint electorate মুসলমানের পক্ষে বাঞ্ছনীয়; কেন? Democracy-র খাতিরে নহে; বাঞ্ছনীয়, কেননা তিনি মনে করেন যে এই প্রণালীতে মুসলমানপ্রাধান্য আরও সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাই। এইখানেই হিন্দুর সহিত মুসলমানের point of view-র প্রভেদ।

মুসলমানেরা যে আন্দোলন করিতে জানে না তাহা নহে, তাহারা যে নিছক ইংরাজের খোসামুদি করিয়াই আজ এই status লাভ করিয়াছে তাহাও সত্য নহে—মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জুটিয়া খিলাফৎ আন্দোলনও তাহারা কিছু কম করে নাই, জিন্না সাহেবের fourteen points লইয়া গত চারি বৎসরও কিছু কম আন্দোলন করে নাই, আজ পর্য্যন্ত হুম্‌কিও কিছু কম দেখাইতেছে না, কিন্তু তাহারা জানে where to stop। বস্তুতঃ গত পঁচিশ বৎসর কাল মুসলমান নেতৃগণ যে ভাবে তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছেন তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী হিন্দুনেতাদিগের যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে।

পরিশেষে দেশের এই গাঢ়ান্ধকার ভবিষ্যৎ দর্শনে একটা কথাই শুধু মনে হইতেছে। সেই কথাটি বাস্তবের প্রতি হিন্দুর চিরন্তন অবজ্ঞা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রচালিত হিন্দু অভ্যুত্থান যদিও ঘটনাচক্রে সুদূর পশ্চিম হইতে আগত ইংরাজ বণিক্‌কুলের হাতে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া গেল, তথাপি গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে—কি উত্তরভারতে কি দক্ষিণাপথে ইংরাজের পর হিন্দুরই প্রাধান্য ছিল—বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে পদগৌরবে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে—অথচ আজ এই বিংশ

শতাব্দীর বত্রিশ বৎসরের ভিতরে চক্ষের সমক্ষে দেখিতে দেখিতে কি পরিবর্ত্তনই না হইয়া গেল! ভারত-উদ্ধারের অতি উচ্চ আদর্শের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া চলিতে চলিতে ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দুর যে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে তাহাই হিন্দু ভুলিয়া গেল। হিন্দু ভুলিয়া গেল ভারতের বিচিত্র বিরাট্ অতীত ইতিহাস, ভুলিয়া গেল যে ইংরাজ এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, সে এখানে চিরদিন থাকিবে না, আজ হউক কাল হউক সে ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইবেই, কিন্তু ভারতের মুসলমান ভারতের শিখ ভারতের হিন্দু ভারতেই থাকিবে, ইহাদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভের জন্য সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, গণতন্ত্রের স্তোকবাক্যে সে সংঘর্ষ ধামাচাপা দেওয়া যাইবে না— চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান ছিন্নভিন্ন চীন সাম্রাজ্য তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। হিন্দু ভুলিয়া গেল যে যদি হিন্দুকে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া অন্যের কাছে আত্মবিক্রয় করিতে হয় তবে হয় ত স্বাধীন ভারত বা হইতে পারে কিন্তু স্বাধীন হিন্দুস্থান কখনও হইবে না।

তাই মনে হয় আপাত শক্তিসঞ্চয়ের লোভে পড়িয়া এই আত্ম-বিক্রয় হিন্দুর বন্ধ করিতে হইবে। আর নিজেকে বিক্রয় করিয়া শক্তি-সঞ্চয়ও ত হইতেছে না, হইবার কথাও নয়। তাছাড়া, পরের নিকট ধার করা সাহায্যের জন্য কাঙ্গাল হইয়া পথে পথে ফিরিবার হিন্দুর কোন আবশ্যকতাও নাই। ভারতের এই বিরাট্ হিন্দুজাতি, এই বীর ত্যাগী সাহসী হিন্দুজাতি, পঁচিশ কোটি সংখ্যাবহুল এই হিন্দুজাতি— এই জাতি যদি সংহত হয়, আত্মস্থ হয়, স্বাবলম্বী হয়, তবে কি শক্তির বাহনই না ইহা হইতে পারে? পঁচিশ কোটি লোক—বোধ হয় এক চীনসাম্রাজ্য ব্যতীত একত্র এতগুলি একদেশীয় একধর্ম্মাবলম্বী লোক জগতে কোথাও নাই—ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কি না করিতে পারে? হিন্দুর এই মাতৃযজ্ঞে অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করিবার আবশ্যকতা কোথায়? কবি হেমচন্দ্রের সেই বজ্রনির্ঘোষ বাণীই শুধু থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে:

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে
দিক্ অন্ধকার করি রণধূমে,
তখন তাহারা কজন ছিল?
এখন তোরা যে শতকোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার?
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

কবির এই অমর বাণী ত অযথার্থ নহে, অত্যুক্তি নহে।

কিন্তু নিজেদের কর্ম্মপন্থার ত্রুটীতে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবার উপক্রম হইলে পরকে গালি পাড়িয়াই ত সমস্যার সমাধান হইবে না। নিজেদের কঠোর আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে, ভুল-ত্রুটী হইয়া থাকিলে নির্ম্মমভাবে তাহার শোধন করিতে হইবে, নূতন কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই বিরাট্ বিশাল ভারতীয় হিন্দুজাতিকে সংহত সচেতন স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে, একজাতিত্ববোধ সঞ্চার করিতে হইবে, হিন্দু সমাজ-শরীরে উচ্চ-নীচ বিভেদজনিত যে বিষ সমাজকে আচ্ছন্ন মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে, সেই বিষ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবের উপর দৃঢ় পদক্ষেপ করিতে হইবে। যদি হিন্দু এই শক্তির সাধনায় সিদ্ধ হয় তবেই জাতীয় স্বাধীনতা সম্ভব, তবেই হিন্দুস্থানে হিন্দুর স্থান চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

নমো হিন্দুস্থান!

আশ্বিন, ১৩৩৯।

—:•:—

অনুন্নত হিন্দু ও মহাত্মা গান্ধী

অনুন্নত হিন্দু ও মহাত্মা গান্ধী

কিছুদিন ধরিয়া অনুন্নত-হিন্দু-সমস্যার কলরব কিছু বেশী রকম শুনা যাইতেছে এবং সেই কলরব ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে মহাত্মা গান্ধীর দুই চারিটি উদাত্ত বাণীও শ্রুতিগোচর হইতেছে। সেই সব বাণীর কল্যাণে অনেকের মনে এই প্রকার ধারণার উদ্ভব হওয়াও বিচিত্র নহে যে হিন্দুসমাজ এ যাবৎ তাহার অন্তর্ভুক্ত অবনত শ্রেণীর উন্নতি ও উদ্ধারের জন্য বিশেষ কিছুই করে নাই, শুধু আজই মহাত্মার বজ্রনির্ঘোষে তাহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে এবং এবিষয়ে যাহা কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব হিন্দুসমাজের এই উৎকট সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টার জন্য যদি কাহারও কোন প্রশংসা প্রাপ্য থাকে, তবে তাহা নিছক মহাত্মাজীরই প্রাপ্য।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে, জনসাধারণের স্মরণ-শক্তি বড় ক্ষীণ। বেশীদিন পূর্ব্বের কথা জনসাধারণ মনে রাখিতে পারে না। তাহারা চলন্ত বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে এবং তাহাদের সমস্ত মনোযোগ সেইদিকেই আকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ সেই বর্ত্তমান কার্যাকলাপের সহিত যদি আনুষঙ্গিক ঢক্কানিনাদ অতি প্রবলভাবে চলিতে থাকে, তবে ত ঠাণ্ডাভাবে পূর্ব্বেতিহাস পর্য্যালোচনার ফুরসুতই তাহাদের থাকে না।

কিন্তু খুব সহজ ও রুচিকর না হইলেও, কোন সামাজিক আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা সঠিক ধারণা করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাসের আলোচনা অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমান অনুন্নত-হিন্দু-সমস্যাঘটিত আন্দোলনেও এই কথা প্রযোজ্য। তাই এই সমস্যার উদ্ভব, ইহার পরিণতি, এবং ইহার সমাধানকল্পে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টা কতটুকু এবং তাহা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

সমস্যার উদ্ভব যে আজই হইয়াছে এমন নহে। ইহার ভিত্তি খুঁজিতে গেলে বহুদূর অতীত পর্য্যন্ত খনন করিতে হয়। স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতীয় হিন্দু-সমাজ-সংস্থান বর্ণ-বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার কারণ বহুবিধ হইতে পারে—গুণকর্ম্মবিভাগশঃ সমাজের ভিতরে বিভিন্ন বৃত্তি-বিভাগ হইতে ক্রমশঃ জাতি-বিভাগ ঘটিয়া থাকিতে পারে—আর্য্যজাতি সমগ্র ভারতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার ফলে বিভিন্ন অনার্য্যজাতি বিভিন্ন শাখায় শূদ্র বা অন্ত্যজ জাতিরূপে হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে স্থান পাইয়া থাকিতে পারে—ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণেই হিন্দুসমাজের এই বর্ণবিভেদ সৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। সে সব সমাজতত্ত্বঘটিত আলোচনা এপ্রসঙ্গে করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আসল কথাটা লইয়া কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে

যখন হইতে আমরা হিন্দুসমাজকে পরিপূর্ণ সুগঠিত সুসংবদ্ধ সমাজরূপে দেখিতে পাই, তখন হইতেই জন্মগত বর্ণ-বৈষম্য ও তদানুষঙ্গিক অধিকার ও বৃত্তি-বৈষম্য সেই সমাজের মূলনীতি। দুই একটি অন্যথা দৃষ্টান্তে—যথা, তপস্যাবলে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য পদবী লাভ, ইত্যাদি—মূলনীতির কোন অপহ্নব ঘটায় না। বরং ইংরাজী প্রবাদ—"The exception proves the rule"—অনুসারে মূলনীতির গভীরতা ও ব্যাপকতারই পরিচয় দেয়।

মনুসংহিতায় যে সমাজের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমাজ বর্ণ-বৈষম্যমূলক সমাজ; এমন কি তাহাতে বর্ণ-বিভেদের চরম নিদর্শন যে অস্পৃশ্যতা, সে অস্পৃশ্যতার উদাহরণেরও কোন অভাব নাই। একদিকে শূদ্র চণ্ডাল অপর দিকে দ্বিজাতি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ—ইহাদের প্রতি ব্যবহারের এবং ইহাদের অধিকারের যে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ সমাজে প্রচলিত ছিল, কেহ যদি তাহার একটা ধারণা করিতে চাহেন তবে তিনি মনুসংহিতোক্ত দণ্ডনীতি পাঠ করিবেন। তাহা হইলে আর প্রাচান হিন্দুসমাজের সাম্যবাদ লইয়া আস্ফালন করিতে হইবে না। তাই যখন মাঝে মাঝে মহাত্মা গান্ধীর মুখে শুনিতে পাই যে হিন্দুশাস্ত্রে বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা কোথাও পাওয়া যায় না এবং যদি কোথাও পাওয়া যায় তবে তাহা শাস্ত্রই নহে, তখন হাসি পায়। কারণ শাস্ত্রের এবংবিধ গান্ধীয় সংজ্ঞাতে মনু-পরাশরও অপশাস্ত্রের কোটায় গিয়া পড়ে। আর মনু-পরাশরই যদি অশাস্ত্রীয় হইল তবে হিন্দু কাহাকে শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করিবে?

বস্তুতঃ এ প্রকার আত্মপ্রতারণা করিয়া কোন লাভ নাই যে আমাদের সমাজে প্রাচীনকাল হইতে ঘোরতর বর্ণ-বৈষম্য ও অধিকারভেদ প্রচলিত ছিল না। বরং যাঁহারা এই প্রকার ভেদ-বৈষম্যকে সমাজের সংহতি ও উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সরলভাবে

স্বীকার করা উচিত, প্রাচীন হিন্দুসমাজে এই প্রকার ভেদ-বৈষম্য যদি থাকিয়াও থাকে, তাহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। সে সমাজে তদানীন্তন অবস্থাতে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা সে গবেষণারও কোন প্রয়োজন বোধ করি না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের আবেষ্টনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আমরা বুঝিয়া থাকি যে এই বর্ণ-বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজের শক্তি ও উন্নতির পরিপন্থী, উদার মানবতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমাদের প্রতীতি হইয়া থাকে যে জন্মগত অধিকারভেদ মনুষ্যত্বকে সঙ্কুচিত করে, অপমানিত করে, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য শাস্ত্রীয় বচনের চুলচেরা বিশ্লেষণ নয়—আমাদের কর্ত্তব্য মনু-পরাশর-গীতাতে যাহাই থাকুক না কেন, বর্ত্তমান আদর্শানুযায়ী সাম্যের ভিত্তির উপর সমাজকে পুনর্গঠিত করা।

যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম। আমাদের সমাজের এই সমস্যা সুদূর অতীতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজের প্রথম অবস্থায় এই বর্ণ-বিভাগের যতটা বা তরলতা ছিল, ক্রমশঃ সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই তরলতা শুকাইয়া গেল এবং কঠিন বৈষম্যে পরিণত হইল। তাছাড়া যেখানেই আর্য্যেতর জাতির সহিত সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ বেশী মাত্রায় হইতে লাগিল, সেইখানেই বংশধারার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এই বৈষম্যের বর্ম্ম আরও কঠিনতর হইয়া উঠিল। দাক্ষিণাত্যের সংখ্যাল্প আর্য্য ও সংখ্যাবহুল অনার্য্যের সমবায়ে যে হিন্দুসমাজ গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাতে অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্যের এত বাড়াবাড়ির ইহাই হেতু। আর উত্তরভারতেও মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কঠোর সমাজ-ব্যবস্থার মূলেও এই একই কারণ। উভয়ই আর্য্য-সমাজের আত্মরক্ষার gesture মাত্র।

পাশ্চাত্য জাতির ভারতে আগমন এবং ক্রমশঃ ভারতে রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-সমাজে আবার অন্যবিধ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। যে যুগে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল, ইউরোপের ইতিহাসে সে এক romantic idealism-এর যুগ। তখন ইংলণ্ডে democracy বা পার্লামেণ্টারী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে, ফ্রান্স সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কাব্য-সাহিত্যে তখন শেলি বায়রণ গেটের যুগ, তারও পরে ইটালীর মন্ত্রগুরু মাট্সীনির আবির্ভাব— সেই liberty, equality, fraternity-র যৌবন-জল-তরঙ্গ তখন রোধিবে কে? সেই তরঙ্গের অভিঘাতে সুকঠিনবর্ম্মবদ্ধ সুপ্রাচীন হিন্দু সমাজের সুদৃঢ় শৃঙ্খলা পর্য্যন্ত শিথিল হইতে লাগিল। আরও দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপ ভারতের উপর আপতিত হইলে হয়ত সহসা এতটা বিপ্লব সংঘটিত হইত না।

সে যাহা হউক, নবভাবোন্মত্ত ইউরোপের সাম্যবাদ, স্বাধীনতাবাদ, মৈত্রীবাদ ভারতীয় হিন্দুসমাজের সুপ্তচৈতন্যকে এমনভাবে নাড়া দিল যে হঠাৎ ইহা একপ্রকার দিশাহারা হইয়া পড়িল। অবশ্য এই দিগ্‌ভ্রান্ত ভাব শীঘ্রই সমাজ কাটাইয়া উঠিল, ভারতের সর্ব্ববিধ আচার অনুষ্ঠান বিধির উপর যে অহেতুকী অশ্রদ্ধা শিক্ষিত সমাজকে প্রথমে প্লাবিত করিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ দূর হইয়া গেল, স্বাভাবিক দেশাত্মবোধ ও আত্মাভিমান সমাজকে আবার প্রকৃতিস্থ করিল; কিন্তু পূর্ব্বের সেই অবিসংবাদিত শাস্ত্রবাদ আর ফিরিয়া আসিল না, বর্ত্তমান যুগের নূতন আদর্শের আলোকে পরখ্ করিয়া লইবার অভ্যাস জন্মিল এবং তাহার ফলে সমাজ-সংস্থান ও আচার-ব্যবহার দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এই পরিবর্ত্তনের একটা বড় লক্ষণ দেখা গেল অবনত জাতির প্রতি উচ্চতর জাতির ব্যবহারে। ক্রমেই সেই ব্যবহার অধিকমাত্রায়

সহানুভূতিপূর্ণ ও শোভন হইয়া উঠিতে লাগিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মসমাজ, পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ, বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজ, তাহাদের সাম্যমূলক আদর্শ ও আচার দ্বারা সনাতন হিন্দুসমাজকেও ক্রমেই অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই জাতিগত prejudice কমিয়া আসিতে লাগিল।

তাছাড়া, আরও দুইটি কারণ এই বিষয়ে কাজ করিতেছিল। এই নূতন সভ্যতায় ব্যবসায়বাণিজ্য ব্যপদেশে পুরাতন বৃত্তি-বিভাগ আর অটুট রহিতে পারিল না। সমাজের প্রত্যেক স্তরের ভিতরেই অনেককে জাতি-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিতে হইল, ব্রাহ্মণের ছেলে dyeing and cleaning-এর দোকান খুলিয়া রজকবৃত্তি অবলম্বন করিল, কায়স্থের ছেলে tannery খুলিয়া চর্ম্মকার সাজিল, ধোপার ছেলে মার্চ্চেণ্ট অফিসে কেরাণী হইয়া কায়স্থবৃত্তি ধরিল, এইরূপ economic বিপ্লবের দাপটে সব ওলট-পালট হইতে লাগিল। গ্রামের সমাজে ভাঙ্গন ধরিয়া ক্রমেই নগরে নগরে লোকসমাগম হইতে লাগিল এবং নগরে সমাজের বাঁধন স্বভাবতঃই কম। সহরে লোকদের মধ্যে আত্মীয়-সম্বন্ধ খুবই কম, সহরের ভিতরে কে বা কাহাকে চিনে? রেলে ষ্টীমারে জাতিনির্ব্বিশেষে যাতায়াত করিতে হইল, সেখানে অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাছ-বিচার চলে না। এইরূপে জাতিবিভাগের অনেকটা শিথিলতা আসিয়া পড়িল।

এই অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া রাজনৈতিক কারণও আসিয়া পড়িল। রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুনেতৃগণ দেখিলেন যে হিন্দুসমাজের অধিকাংশই যদি অবনত, অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য, অশিক্ষিত থাকে, তবে হিন্দুসমাজই তাহাতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং তদপেক্ষা সাম্যমূলক সমাজ, যথা মুসলমানসমাজ, অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবে; অতএব হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যও অনুন্নত শ্রেণীর

সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা অত্যাবশ্যক, তাহাদের উপর সামাজিক দুর্ব্ব্যবহার, ব্যক্তিগত অত্যাচার, আর্থিক শোষণ ইত্যাদির অবিলম্বে প্রতিকার করা উচিত। এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুগণই প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইলেন।

আজ গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ আন্দোলনের ফলে এবং মহাত্মা গান্ধীর নিজের কতকটা অবিমৃষ্যকারিতার ফলে অনুন্নতহিন্দু ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্যের সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও একথা মনে রাখিতেই হইবে যে হিন্দুসমাজভুক্ত অনুন্নতশ্রেণীকে উন্নত করিবার ও শিক্ষিত করিবার এযাবৎ যত প্রয়াস হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেশভক্ত আদর্শবাদী উচ্চবর্ণের হিন্দুই চিরদিন অগ্রণী হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুনেতৃগণই সমাজসংস্কার ও নিম্নজাতির উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

পঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ নিম্নজাতির উন্নয়নে ও হিন্দুসমাজের শক্তিসংরক্ষণে শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন দ্বারা কতখানি কাজ করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। আর আমাদের বাঙ্গালা দেশে রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই সমাজসংস্কারের ধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে; এবং উন্নত আদর্শের প্রসারে, নাগরিক সভ্যতার অভ্যুদয়ে ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে জাতি-বৈষম্যমূলক আচার ও prejudice প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সামাজিক-অনুষ্ঠানগত বর্ণবিভেদ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানগত অধিকার-ভেদ আছে বটে, কিন্তু যাহাকে civic disability বলা যায়— যেমন সাধারণের পুকুর হইতে জল পান করিতে বাধা, সাধারণের বিদ্যালয়ে পড়িতে বাধা, সাধারণের রাস্তাতে চলিতে বাধা, প্রভৃতি, ইহার লেশমাত্র

সারা বাঙ্গালা খুঁজিয়া আজ পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। অথচ নিম্নস্তরের লোকদিগের প্রতি এই যে শোভন ও সদয় ব্যবহার ইহার জন্য গান্ধী-আন্দোলনের আবশ্যকতা হয় নাই। সহজ ও স্বাভাবিক রীতিতে কালধর্ম্মের ও আবেষ্টনের প্রভাবে হিন্দু জনসাধারণের মনোভাবই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে পারেন যে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে Society for the Improvement of Backward Classes কাজ করিতেছে। এই সমিতি আগাগোড়াই উচ্চবর্ণের হিন্দু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, এবং এই সমিতি নিম্নজাতির শিক্ষার জন্য প্রায় পাঁচ শত বিদ্যালয় নিয়মিত ভাবে চালাইতেছে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছে। অথচ গান্ধী-আন্দোলনের ন্যায় ইহার কোন বাগাড়ম্বর নাই, ঢক্কানিনাদ নাই, বাণীর বাহুল্য নাই—নীরবে এত বড় একটা কাজ সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। শ্রদ্ধেয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সভাপতি। যাহাতে অবনত হিন্দু আর অবনত না থাকে, শিক্ষায় আচারে সামাজিক রীতিনীতিতে উন্নত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং বিশাল হিন্দুসমাজের দৌর্ব্বল্যের হেতুভূত না হইয়া শক্তির আধার হইতে পারে, ইহারই জন্য এই সমিতি কার্য্য করিতেছে।

কাউন্সিলে আঠারো আনা seat কিংবা মন্দিরাভ্যন্তরে জোর করিয়া প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ন্যায় অনাবশ্যক অবান্তর কৃত্রিম কার্য্যতালিকা সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর ও উচ্চস্তরের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিরোধ বাধাইয়া নিম্নস্তরের রাতারাতি উন্নতি সাধন করিবার কল্পনা বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। তাহারা জানে যে কোন স্থায়ী সংস্কার সাধন করিতে হইলে গোড়া হইতে গড়িয়া তুলিতে হয়। এবং তাহারা বিগত সার্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সেই ভাবেই কার্য্য করিয়া

আসিতেছে এবং তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। একথা অবশ্য আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে সামাজিক মতের সংস্কার সাধনে সমাজের গোঁড়াদিগের নিকট কোনও বাধাই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই সংস্কার-আন্দোলন এতটা সহজ স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হইয়াছে যে সামাজিক বিবেক ক্রমশঃই সংস্কারের অনুকূল হইয়াছে; এবং উচ্চ এবং নিম্নস্তরের হিন্দুর ভিতরে মনোমালিন্যের কোনও কারণ ঘটে নাই। বরঞ্চ উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের অনুকূলভাবে আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ শিক্ষা দীক্ষার প্রতি ক্রমশঃই অধিক মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ও উন্নতির দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছে। মোটের উপর দেখা যায় যে দেশে নিম্নজাতির উন্নতির আন্দোলন বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, জাতি-বিদ্বেষ ও রেষারেষির দূষিত বায়ুতে বিষাক্ত হইয়া পড়ে নাই। আন্দোলনের ভিতরে এই বিষাক্ত বায়ুপ্রবাহ সঞ্চার করা মহাত্মাজীর অদূরদর্শিতার ফল।

মহাত্মাজী কি প্রকারে অনুন্নত হিন্দু সমস্যার সহিত জড়াইয়া পড়িলেন তাহার একটু বর্ণনা দেওয়া এস্থলে আবশ্যক। মহাত্মা গান্ধী স্বভাবতঃই সদয়হৃদয় ব্যক্তি, দরিদ্র জনসাধারণকে তিনি স্বতঃই ভালবাসেন, তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদে, তাহাদের অবস্থার কি প্রকারে উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় সে বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং যে ক্ষেত্রে তাহাদের উপর সামাজিক অবিচার অত্যাচার দেখিতে পান তথায়ই তিনি ব্যথা পান। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীই যে একমাত্র এই প্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা নহে, আমাদের দেশে বিগত শতাব্দীতে অনেক মহাপুরুষই জন্মিয়াছেন যাঁহারা পরের দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। আমাদের বাঙ্গালায় আর অধিক নাম করিতে হইবে না; প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিলেই

যথেষ্ট হইবে। যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধীও এই ধরণের একজন দয়ালু ব্যক্তি। তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ভারতময় পরিভ্রমণ করিয়া স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন অন্যান্য অভাব-অভি-যোগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজভুক্ত নিম্নশ্রেণীর সামাজিক হীনতা ও দুরবস্থার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন যে হিন্দুসমাজ যখন শত শত বৎসর ধরিয়া তাহার অন্তর্ভুক্ত নিম্ন শ্রেণীর উপর অবিচার করিয়াছে, তাহাদের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়াছে, তখন এই চিরাচরিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুসমাজকেই করিতে হইবে।

এই প্রায়শ্চিত্ত-প্রবণ মনোবৃত্তি মহাত্মা গান্ধীর একটি বিশেষত্ব। ব্যক্তিগত জীবনে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিজেকে পীড়ন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার কোন সার্থকতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু সমাজগত জীবনে কিংবা রাষ্ট্রগত জীবনে যে এক পুরুষের কৃত অবিচার বা অনাচারের শাস্তিস্বরূপ আর এক পুরুষ নিজেকে পঙ্গু করিয়া উৎপীড়িত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলে কোনই সার্থকতা হয় না সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যদি কাহারও উপর অত্যাচার বা অবিচার হইয়া থাকে তবে শুধু ন্যায়বিচার ও মনুষ্যত্বের খাতিরেই তাহার অবসান করিতে হইবে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য নহে। প্রায়শ্চিত্তের খাতিরে একজনের প্রতি অবিচারের প্রতিকারস্বরূপে আর একজনের প্রতি অবিচার ও উৎপীড়ন বিধান করিলে অবিচারের প্রতিবিধান হয় না—two wrongs cannot make a right। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবাদ মহাত্মাজীর মনকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে সমাজ-জীবনের এই সহজ সত্যের প্রতি তিনি অন্ধ।

গান্ধীচরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে হঠাৎ কোন একটি বিষয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি সজাগ হইয়া উঠিলে এমনই

অতিরিক্তভাবে সজাগ হইয়া উঠেন যে মাত্রাজ্ঞান একেবারে হারাইয়া ফেলেন। কোন একটি ব্যাপার important হইলেই যে all-important হয় না, সে জ্ঞান তখন আর তাঁহার থাকে না; অন্যান্য ব্যাপারেরও যে কতটা আবশ্যকতা থাকিতে পারে, তাহাদিগের অনুপাতে প্রথম ব্যাপারটির গুরুত্ব কতটুকু, অর্থাৎ যাহাকে বলে sense of proportion, তাহা একেবারে হারাইয়া ফেলেন। মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টির এই সঙ্কীর্ণতা বা একদেশদর্শিতা, সমাজের প্রতি সমগ্র দৃষ্টিপাতের অনভ্যাস—যাহার ফলে কতকগুলি groove বা গণ্ডী বা formula-র ঊর্দ্ধে তিনি উঠিতে পারেন না—ইহার দরুণ বিগত চতুর্দ্দশ বৎসরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় জীবনে বহু অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে।

উদাহরণ প্রচুর রহিয়াছে। হঠাৎ গান্ধীজীর খেয়াল হইল যে অনেক লোক বহু সময় আলস্যে কাটায়, সেই সময়টাতে যদি চরকায় সূতা কাটে তবে শ্রমশীলতাও বাড়ে এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হয়, এবং তদ্দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থার কতকটা লাঘব হইতে পারে। উত্তম কথা, ইহার যুক্তির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই। আজকালকার অর্থ-নৈতিক অবস্থায় আট ঘণ্টা অবিরত পরিশ্রম করিয়া আট পয়সা মূল্যের সূতা কাটাতে লোককে প্রবৃত্ত করান যাইবে কিনা সন্দেহস্থল বটে, কিন্তু যদি যায়ই তবে তাহাতে ক্ষতি কিছুই নাই বরং কিঞ্চিৎ উপকারই হয়। শুধু সূতা কাটা কেন, আরও অন্যান্য কুটীর শিল্প বিস্তারেরও সেই একই উপকারিতা। কিন্তু এতটুকু importance-এ মহাত্মা গান্ধীর মন উঠিল না—তাঁহার বাণী ঘোষিত হইল, চরকা দ্বারা সূতা কাটা স্বরাজের অমোঘ অস্ত্র। স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সূতা কাটিয়া কিরূপে আয়ত্ত হইবে তাহা সহজ বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু আপ্তবাক্য প্রচারিত হইল, সূতা কাটিয়া যাও, ৩১শে ডিসেম্বরের রজনীর অন্তে স্বরাজ লাভ অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় উদাহিরণ, লবণ তৈয়ারী। সমুদ্রের ধারে গিয়া বড় বড় কড়াতে করিয়া লোণাজল সিদ্ধ করিতে থাক, সিদ্ধ হইয়া গেলে শুধু লবণ নয় স্বরাজ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গান্ধীজীর এই অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন। তাঁহার বহু পূর্ব্বে এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, গান্ধীজীর তখন জন্মও হয় নাই। যে সব মহাপুরুষ হিন্দুসমাজের এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে ইহার আবশ্যকতা বুঝিতেন না তাহা নহে, হিন্দুসমাজকে সবল ও সংহত করিতে হইবে ইহা তাঁহারা গান্ধীজী অপেক্ষা কম বুঝিতেন না, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা মাত্রাজ্ঞান হারান নাই। এই আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জীবনে একমাত্র করণীয়, এরকম অদ্ভুত ধারণা তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের বহুধা বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখাকে কৃত্রিম ঐক্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহারা "হরিজন" অভিধা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। (আর এই বিচিত্র অভিধার অন্তর্লীন মনোবৃত্তি দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়—অন্য সব জনকে কি শ্রীহরি ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন?) আর এই আন্দোলনের জন্য কথায় কথায় উচ্ছ্বাস অভিমান ও উপবাস তাঁহারা অভ্যাস করেন নাই। তাঁহারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আরও পাঁচটা কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; এবং চেষ্টানুযায়ী উন্নতিবিধানে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এ বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কোন temperate যুক্তিসঙ্গত মাত্রাযুক্ত কর্ম্মপদ্ধতিতে ত মহাত্মাজীর মন উঠে না। যখন যেটাতে তাঁহার খেয়াল হইবে সেইটাই সমাজ-ব্যাধির একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া তিনি প্রচার করিবেন, চরকা লবণ হইতে হরিজন আন্দোলন পর্য্যন্ত এই কাহিনী সর্ব্বত্র। এবং এই প্রকার সঙ্কীর্ণ উদ্দামতার ফল হয় এই যে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড

হইয়া যায়। গান্ধীপ্রবর্ত্তিত হরিজন আন্দোলনেও ইহার অন্যথা হয় নাই।

মহাত্মা গান্ধী আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিতেছেন, ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনের ভিতরেও ইহার একটু স্থান ছিল; এবং নিম্নশ্রেণীর একটি বালিকাকে তিনি নিজের পরিবারে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই পারিবারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও মাঝে মাঝে বক্তৃতাদি প্রদান ছাড়া নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের জন্য কিংবা শিক্ষাপ্রদানের জন্য যে বিশেষ কিছু করিয়াছেন, এমন কথা জানা যায়না। তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে practical কাজ অপরে সাধন করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে কি কাজ হইয়াছে পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। কিন্তু গত দুই বৎসর ধরিয়া অর্থাৎ লবণ জ্বাল দিবার উৎসাহাগ্নি যখন অনেকটা নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তখন হইতে হরিজন-উদ্ধারকে গান্ধীজী স্বরাজের তৃতীয়ঃ পন্থাঃ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং যে ভাবে তিনি হরিজনের উদ্ধারকর্ত্তা সাজিলেন তাহার একটু বিচিত্র ইতিহাস আছে।

নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের উপলক্ষে নানাবিধ আলোচনা বিগত সাত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে সাইমন কমিশন রিপোর্ট পেশ করিলেন; তাহাতে গান্ধীপ্রমুখ হিন্দুনেতাদের মন উঠিলনা। তৎপরে গোলটেবিলের অবতারণা হইল। সেই গোলটেবিলেই সদ্য সদ্য Dominion Status প্রতিষ্ঠিত হইবে এই আশ্বাস দিতে লর্ড আরুইন অপারগ হওয়াতে গোলটেবিলে পদাঘাত করিয়া গান্ধীচালিত কংগ্রেস লাহোরে গিয়া স্বাধীন ভারতের ঘোষণা করিলেন এবং যথাবিধি Union Jack পোড়াইলেন, এবং মাস দুয়েক গবেষণার পর লবণ জ্বাল দেওয়াই স্বরাজসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করিয়া গান্ধীজী এক শুভ ত্র্যহস্পর্শে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন হরিজনপর্ব্ব আরম্ভ হয় নাই—লবণপর্ব্ব চলিতে লাগিল।

পাদ্রীপ্রতিম গান্ধী-ভক্ত বড়লাট লর্ড আরুইন বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, দেখিতে লাগিলেন ব্যাপার কতদূর গড়ায়। শেষটা বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিয়া গান্ধীকে জেলে পূরিলেন। এদিকে গোলটেবিলের তোড়জোড়ও চলিতে লাগিল। মডারেট নেতারা যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। Patriot-রা তখন জেলে রহিয়াছেন, সুতরাং গোলটেবিলের যাত্রীদিগকে কংগ্রেস পন্থীরা traitor আখ্যায় যথারীতি ভূষিত করিতে লাগিলেন। এদিকে কোনমতে মহাত্মাকে বিলাতে যাইতে রাজী করা যায় কি না এই জন্য আরুইন সাহেব মডারেট সাপ্রু-জয়াকরকে জেলে দূত প্রেরণ করিলেন। দৌত্যে কোন ফল দর্শিল না, গান্ধী-নেহ্রু প্রমুখ নেতৃগণ একপ্রস্থ হিসাব বাহির করিলেন যাহাতে জার্ম্মানীর reparations-এর মত দেখান আছে যে ইংলণ্ডকে বিগত দেড়শত বৎসরের খেসারতস্বরূপ কম করিয়া আটশত কোটি টাকা ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। শুধু Dominion Status-এ হইবে না, আগে ফেল কড়ি তারপরে অন্য কথা। ফিরিস্তির বহর দেখিয়া ত বড়লাটের আক্কেল গুড়ুম

গান্ধীজীকে বাদ দিয়াই শেষে গোলটেবিল গড়াইতে আরম্ভ করিল। সেখানে মোটামুটি একটা "সুরক্ষিত" স্বরাজের খসড়া খাড়া হইয়া উঠিল; তারপর সাপ্রু প্রভৃতি মডারেটরা ইংরাজকে ধরিয়া পড়িলেন, এবার গান্ধী প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। মডারেটদের অনুনয়ের জোরে গান্ধীজী খালাস পাইয়া করিলেন, আরুইন সাহেবের সঙ্গে প্যাক্ট। তারপর নূতন বড়লাট আসিলেন লর্ড উইলিংডন। তিনি পনের বৎসর ভারতবর্ষে কাজ করিয়া চুল ও বুদ্ধি পাকাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গেও গান্ধীজী তাঁহার প্রিয় বার্দ্দোলি-বোরসাদ প্রভৃতির খাজনা লইয়া করিলেন এক প্রস্থ কোন্দল। যাহা হউক শেষ অবধি বিলাতগামী নৌকায় গিয়া চড়িলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গোলটেবিলগামী গান্ধীজীকে

কেহ traitor বলিল না। সেখানে গিয়া অনেক লম্বাচওড়া বুলি ঝাড়িলেন। তারমধ্যে কাজের কথা বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু তখনই আরম্ভ হইল হরিজনপর্ব্বাধ্যায়।

নূতন শাসনসংস্কারের সম্ভাবনাতে দেশে সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব স্বার্থ-সংরক্ষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—যেমন প্রতিবারই হয়। মুসলমানগণ পূর্ব্বের বারই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছিল, এবার সেই অধিকার আরও কায়েমী করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসিল। শিখেরা বলিল যে তাহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাহে না—তবে মুসলমানকে যদি দেওয়া হয় তবে তাহাদেরও চাই। হিন্দুসমাজের অনুন্নত শ্রেণী পূর্ব্বের বারে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি বা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন কিছুই পায় নাই। তাহারা এই কয় বৎসরে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত হইয়া আরও কিছু উচ্চাভিলাষী হইয়াছে, এবং রাজনৈতিকক্ষেত্রে একটু স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইয়াছে, কাজেই তাহারাও কেহ বা স্বতন্ত্র প্রতিনিধি কেহ বা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দাবী করিতে লাগিল। এই সব দাবীর বিষয়ে, সাইমন কমিশন এবং তাহার পর বড়লাট আরুইনের Despatch, উভয়েই আলোচনা করিয়াছিল এবং কোন কোন বিষয়ে অনুকূল মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছিল। মোট কথা রাজনৈতিক-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে হিন্দু নিম্নশ্রেণীর জন্য কতকটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা মোটেই কল্যাণকর নহে, কিন্তু তথাপি অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ যুক্তনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে নিম্নশ্রেণীর জন্য কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রতিনিধি না দিয়া পারা যাইবে না।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এই সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডা ও কোলাহলই প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর মুখপাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন ডাক্তার আম্বেদকর। তিনি এক সময়ে বোম্বাইয়ের সাইমন সহকারী কমিটির

মেম্বর ছিলেন, তখন তিনি নিম্নশ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরোধী ছিলেন, এবং যুক্তনির্ব্বাচন মূলে কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রতিনিধি থাকিবার পক্ষেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি সেই কথাই বলিয়াছিলেন। তাই দ্বিতীয় বৈঠকে তিনি বিনীতভাবে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করিয়া জানাইলেন যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চাহে। তখন গান্ধীজী—পরবর্ত্তী বৎসরে হরিজন-দুঃখ-বিগলিত-হৃদয় গান্ধীজী—কি বলিলেন? তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন :

কদাপি ন। নিম্নশ্রেণীকে কোন প্রকার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা কি স্বতন্ত্র প্রতিনিধি হিসাবে কি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন হিসাবে। যদি দেওয়া যায় তবে হিন্দুসমাজের অঙ্গচ্ছেদ হইয়া যাইবে। আর তাছাড়া নিম্নশ্রেণীর আবার রাজনৈতিক অধিকারের আবশ্যকতা কি? তাহারা সামাজিক অত্যাচার ও ধর্ম্মবিষয়ক অবিচারের হাত হইতে মুক্ত হইলেই যথেষ্ট। নিম্নশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা যাহারা বলে, তাহারা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

এসম্বন্ধে গান্ধীজীর অতি প্রাঞ্জল অতি পরিষ্কার নিজের ভাষাই উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। তাঁহার ভাষা এই :

I can understand the claims advanced by other minorities, but the claims advanced on behalf of the untouchables is to me the unkindest cut of all. It means the perpetual bar-sinister. *Separate electorate and separate reservation is not the way to remove this bar-sinister.* We do not want on our register and on our own census untouchables classified as a separate class. I am speaking with a due sense of responsibility when I say it is not a

proper claim which is registered by Dr. Ambedkar when he seeks to speak for the whole of the untouchables in India. *I do not mind the untouchables being converted into Islam or Christianity.* I should tolerate that, but I cannot possibly tolerate what is in store for Hinduism if there are these two divisions set forth in the villages. *Those who speak of political rights of untouchables do not know India and do not know how Indian society is to-day constructed.* Therefore I want to say with all the emphasis that I can command that *if I was the only person to resist this thing I will resist it with my life.*

গান্ধীজীর এই অস্বাভাবিক উষ্মাতে সকলেই বিস্মিত হইল। মহাত্মাজী বলেন কি ? স্বতন্ত্র প্রতিনিধি কিংবা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন কিছুই ইনি নিম্ন-শ্রেণীকে দিতে নারাজ, এমনকি না দিবার জন্য জীবনপণ করিতেও প্রস্তুত। হাঁ, বুঝা যাইত, যদি খাঁটী জাতীয়তাবাদী বা nationalist-এর মত গান্ধী বলিতে পারিতেন, না, আমি কোন সম্প্রদায়ের জন্যই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বা স্বতন্ত্র প্রতিনিধি হইতে দিব না, সমগ্র ভারতীয় জাতি হিন্দুমুসলমান-শিখ নির্ব্বিশেষে যুক্তনির্ব্বাচনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। এরকম কথা বলা বর্ত্তমান অবস্থায় practical politics হয়ত হইত না, তবু জাতীয়তার উচ্চ আদর্শ তাহাতে বজায় থাকিত। কিন্তু জোর গলায় সে কথা বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

ডাঃ আম্বেদকর যখন মহাত্মা গান্ধীর উক্তিতে মর্ম্মাহত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি তাহা হইলে মুসলমান ও শিখদিগের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সমর্থন করেন কেমন করিয়া ? তখন মহাত্মাজী অতি মিহি সুরে উত্তর করিলেন:

The Congress has reconciled itself to special treatment of the Hindu-Moslem-Sikh tangle. There are sound historical reasons for it. But the Congress will not extend that doctrine in any shape or form. The interests of the untouchables are as dear to the Congress as the interests of any other body or of any other individual throughout the length and breadth of India. Therefore, I would most strongly resist any further special representation. I claim myself in my own person to represent the vast mass of the untouchables.

ব্যস্, সাফ জবাব। আমি, মহাত্মা গান্ধী, ভারতীয় অস্পৃশ্য জনসাধারণের এক এবং অদ্বিতীয় প্রতিনিধি। তুমি আম্বেদকর বাপু কে হে, যে নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতেছ? আমি বলিতেছি যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধির কোন আবশ্যকতা নাই অস্পৃশ্যদিগের। আমার কথার উপর কথা? হাঁ হাঁ, মুসলমান ও শিখদিগের বেলায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে রাজী হইয়াছি বটে, তবে তাহার সাঁচ্চা ঐতিহাসিক কারণাবলী রহিয়াছে যে।

আম্বেদকর বলিলেন, তোমার সাঁচ্চা ঐতিহাসিক কারণাবলী ত এই যে তোমাকে তাহারা গ্রাহ্যও করে না, তোমার কথায় তাহারা উঠে বসে না, তাহাদের গুঁতার চোটে তোমার "বাবা" বলিতে হয়। তুমি হইলে আসল শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তুমি মনে করিতেছ যে হিন্দুর নিম্নশ্রেণী হীনবীর্য্য বিশৃঙ্খল, তোমার বিরুদ্ধে তাহারা তেজ দেখাইতে সাহস করিবে না। বেশ, দেখা যাউক, আমি কি করিতে পারি। নরম হইয়া ত তোমার নিকট কিছু আদায় করিতে পারা গেল না, একবার শক্ত হইয়াই দেখা যাউক।

মহাত্মাজীর uncompromising এবং arrogant মনোভাবে বিরক্ত হইয়া ডাঃ আম্বেদকর মুসলমান ও ইউরোপীয় নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এবার আর যুক্ত-নির্ব্বাচন-মূলক স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নহে, একেবারে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-মূলে Minorities Pact রচনা করিয়া ফেলিলেন। এই Minorities Pact-এর উপরেই প্রধান মন্ত্র ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের Communal Award-এর প্রতিষ্ঠা। যদি Minorities Pact এবং Communal Award-এর বর্ত্তমান আকারের জন্য কাহারও নৈতিক দায়িত্ব থাকে তবে সে দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর—কারণ এই উভয়ই তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টিহীনতা ও অবিমৃষ্যকারিতার বিষময় ফল। যদি দ্বিতীয় Round Table-এ কতকগুলি লম্বা লম্বা গর্ব্বস্ফীত শূন্যগর্ভ বোলচাল না ঝাড়িয়া বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে তিনি মনোনিবেশ করিতেন, তবে দেশের এই শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইত না।

যাহা হউক, বিলাতে ত বিচিত্র রকমে হরিজনপ্রীতির পরিচয় দিয়া গান্ধী দেশে পদার্পণ করিলেন, এবং পদার্পণ করিয়াই জাহির পণ্ডিতের অতি কৌশলে রচিত no-rent campaign-এর ফাঁদে এমন জড়াইয়া পড়িলেন যে আবার তাঁহাকে Civil Disobedience-এর আস্ফালন করিতে হইল; এবং অনতিবিলম্বে তিনি তাঁহার প্রিয় ইয়ারোদা জেলে উপনীত হইলেন। জেলে গিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেই জানুয়ারী মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আটমাস কাল হরিজনদের সম্বন্ধে টুঁশব্দ উচ্চারণের আবশ্যকতা বোধ করিলেন না—অথচ আজকাল শুনা যাইতেছে যে হরিজন-সেবা হইতে বঞ্চিত হইলে জীবনধারণ নাকি তাঁহার বিস্বাদ ও দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয়। এই বিস্বাদ লাগাটা বোধ করি Communal Award-এর তারিখ হইতে সুরু হইয়াছে। বিস্বাদ

লাগিবার কথাই বটে—সেই আম্বেদকরটা যাহা করিবে বলিয়া গান্ধীকে শাসাইয়াছিল তাহাই অবশেষে সম্পন্ন করিয়া তুলিল! শুধু স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নহে, একেবারে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনই করিয়া লইল! ইহাতে রাগ না হয় কাহার?

তাই মহাত্মাজী সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যে তিনি Civil Disobedience-এর পাণ্ডা, ভুলিয়া গেলেন যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি rebel, ভুলিয়া গেলেন যে তিনি Round Table Conference তথা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত কোন constitution-ই মানেন না, স্বীকার করেন না, করিতে পারেন না—কারণ তাঁহার চালিত কংগ্রেসের creed হইল পূর্ণ স্বরাজ—আর সেই constitution-এর অঙ্গীভূত Communal Award ত অতি তুচ্ছ ব্যাপার! সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, প্রধানমন্ত্রীর Communal Award-এর সমস্ত বিধান পরোক্ষে মানিয়া লইয়া নিম্নজাতির স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বিধানের বিরুদ্ধে তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন—অর্থাৎ কিনা বলিলেন, ভদ্র-লোকের এক কথা, আমি বিলাতে বলিয়া আসিয়াছি যে ইহার বিরুদ্ধে জীবন পণ করিব, সুতরাং উপবাস করিয়া

মরিব, মরিব, আমি মরিব নিশ্চয়,
যদি না এবিধানের নড়চড় হয়।

মহাত্মার মরণপণ! আসমুদ্রহিমাচলের ভক্তবৃন্দ আকুল হইয়া উঠিলেন—এমন কি শান্তি-নিকেতনেও অশান্তির লক্ষণ দেখা দিল—বিশ্বকবি বিশ্বমানবের পানে ছুটিলেন। একমাত্র আম্বেদকর রহিলেন অকম্পিত, তিনি বলিলেন যে ওসব রাজনৈতিক বুজরুকী, political stunt, ঢের দেখা গিয়াছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত—গান্ধীজীর জীবনরক্ষার জন্য Communal Award-এর নামমাত্র অদল বদল-করিয়া

যাহা কিছু তিনি দাবী করিবেন তাহাই গান্ধীভক্তগণ স্বীকার করিয়া লইবেন। তিনি ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-প্রথার নামমাত্র বদল করিয়া যুক্ত-নির্ব্বাচনের উপর panel চাপাইয়া সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণের অধিক বাড়াইয়া লইয়া আম্বেদকর তাঁহার terms হাঁকিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, তথাস্তু। পুণা-চুক্তি সহি করা হইয়া গেল। তারপর পড়িল বিলাতে তারের পালা—নানা দিক্ হইতে তারস্বরে তার চলিতে লাগিল, দোহাই প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, বিলম্বে নালম্, তাড়াতাড়ি চুক্তিনামাটা গ্রাহ্য করিয়া লউন। মন্ত্রী মহাশয় মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, তথাস্তু; আমার Award এবং তদুপরি এই চুক্তির মূলে তোমরা স্বচ্ছন্দ চিত্তে বাহাল তবিয়তে নবীন ভারত-রাষ্ট্র পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকহ।

ভক্তগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। গান্ধীজী কমলা-লেবুর রস পান করিলেন, আর নির্ব্বিঘ্নে মহাত্মাজীর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিয়া বিশ্বকবি শান্তচিত্তে উত্তরায়ণে প্রস্থান করিলেন। আজ বৎসর যখন প্রায় ঘুরিয়া আসিয়াছে তখন শুনিতে পাই যে বিশ্বকবির নাকি ধোঁকা লাগিয়াছে যে পুণার ব্যাপারটা নেহাৎ পুণ্যকর্ম্ম হয় নাই, তিনিও নাকি অপরাপর ভক্তের ন্যায় ভারতের ভাগ্যের একমাত্র ন্যাসরক্ষক হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন, তাই পুণা-চুক্তিতে সাপ না ব্যাং কি মরিল তাহা দেখা আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি শুধু অন্নপ্রাশন করাইয়াই খালাস। যাহা হউক হরিজন পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

কি জন্য যে তিনি এত হট্টগোল করিলেন কিছুই বুঝা গেল না—কারণ যে অনিষ্টের তিনি প্রতিকার করিবেন বলিয়া বিলাতে জীবনপণ করিয়াছিলেন, নিম্ন জাতির জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচনের register, পৃথক্ category, তাহার সমস্তই পুণার ব্যবস্থায় রহিয়া গেল,

লাভের মধ্যে হইল panel—যাহা প্রচ্ছন্ন separate electorate ব্যতীত কিছুই নহে এবং যাহাতে দরিদ্র নিম্নশ্রেণীস্থ candidate-এর নির্ব্বাচন-খরচ ডবল হইল—এবং সর্ব্বাপেক্ষা মজা হইল এই যে বিনা বিচারে বিনা আলোচনায় প্রদেশে প্রদেশে, যেখানে Award অনুসারে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি ছিল এবং যেখানে ছিল না, সর্ব্বত্রই স্থান কাল অবস্থা নির্ব্বিশেষে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দ্ধারিত হইল। অথচ বিলাতে থাকিতে যদি তিনি যুক্তনির্ব্বাচনমূলে নিম্নশ্রেণীর স্বতন্ত্র প্রতিনিধির দাবী মানিয়া লইতেন, তবে panel-ও হইত না, এবং অনেক অল্পসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রতিনিধির ব্যবস্থা করিয়া এই সমস্যার সমাধান হইতে পারিত।

অত্যন্ত serious এবং দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এরকম ছেলেখেলা এরকম নির্লজ্জ প্রহসন বর্ত্তমান ভারতে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও কোনও বিষয়ে ইহার শতাংশের একাংশ levity প্রদর্শন করেন নাই। পুণার ব্যবস্থায় আম্বেদকরের জয় ও গান্ধীর পরাজয় একেবারে প্রকট হইল; শক্তির পরীক্ষায় মহাত্মা হারিয়া গেলেন। তবে তাঁহার আত্মাভিমান কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা হইয়া থাকিতে পারে এই ভাবিয়া যে যাহা হউক, Award-এর একটা কিছু অদল-বদল ত তিনি করিতে পারিয়াছেন, তা ভালই হউক কি মন্দই হউক। পর্ব্ব সমাধা হইয়া গেলে পর তিনি ডাঃ আম্বেদকরের ভয়ানক ভক্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত "হরিজন" পত্রিকায় আম্বেদকরকে দিয়া প্রথম প্রবন্ধ লিখাইলেন, এবং আম্বেদকরের প্রায় একজন শিষ্যই বনিয়া গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায় আরও চমৎকার। বিদ্রোহী এবং আদর্শবন্দী গান্ধী মহাত্মা গভর্ণমেণ্টকে ভিক্ষা জানাইলেন, আমি জেলে থাকিয়াও হরিজন-সেবা করিতে চাহি, তোমরা অনুমতি দেও। সয়তানী গভর্ণমেণ্ট বলিল,

তথাস্তু। কিরূপে সেবা আরম্ভ হইল? সেন্ট পলের epistle-পরম্পরার সংখ্যা অতিক্রম করিয়া গান্ধীজীর epistle-রাজি প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই সব epistle-এর ভিতরে হরিজনসেবার নূতন একটি রকম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সেই নূতন রকমটি এই যে হরিজনদিগকে মন্দিরের অভ্যন্তরে অবাধ প্রবেশাধিকার দিতে হইবে। এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়া উঠিবে এবং এইটি এতদিন না থাকিবার জন্য হরিজনদিগের রাত্রিতে আর নিদ্রা ছিল না।

আম্বেদকর বলিলেন, মন্দির প্রবেশের জন্য আমাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই, আমরা চাই শিক্ষা, আমরা চাই স্বাস্থ্য, আমরা চাই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, আমরা চাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা। একসঙ্গে খাওয়া, ছোঁয়া, বিবাহ, মন্দিরপ্রবেশ, এই সব অবান্তর বিষয় লইয়া আমরা মোটেই মাথা ঘামাইতেছি না। যদি আমরা নিম্নশ্রেণীরা শিক্ষায় অর্থে প্রতিষ্ঠায় উন্নত হইতে পারি, ওসব আপনা হইতেই আসিবে, আর না আসিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আর তাছাড়া বলিলেন, তুমি মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতা ও মন্দিরপ্রবেশ লইয়া ত মহা হৈ চৈ লাগাইয়া দিয়াছ, তবে তুমি বর্ণ-বৈষম্য ও অধিকারভেদের গোড়াতেই কেন ঘা দেও না? একেবারে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধেই কেন যুদ্ধ ঘোষণা কর না? আম্বেদকরের এই স্পষ্ট কথাতে গান্ধীজী একেবারে আঁত্‌কিয়া উঠিলেন। বলিলেন, বল কি হে, বর্ণাশ্রমে ঘা দিব কি? উহা ত অতি উপাদেয় জিনিষ, শুধু অস্পৃশ্যতাতেই আমার আপত্তি। আর মন্দিরপ্রবেশ? ইহা না হইলে আর হরিজনের উদ্ধার নাই, তা তুমি যাহাই বল না কেন।

অতএব গান্ধীজীর অনুশাসনে জোর করিয়া মন্দির প্রবেশের জন্য স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহ সুরু হইল। কোন্ মন্দির সাধারণের, কোন্‌টা বা ব্যক্তিবিশেষের, কে তাহার খোঁজ রাখে? সেই পুরাতন কালিকটের

বিখ্যাত জামোরিণের অধীনে গুরুবায়ুর এক মন্দির ছিল। জামোরিণের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর ভক্তগণ গুরুবায়ুগ্রস্ত হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ধরিয়া ধরিয়া সত্যাগ্রহ চালাইতে লাগিলেন, referendum করিতে লাগিলেন, আরও কত কি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জামোরিণের এলাকাতে বায়ুর গুরুত্ব কিছুতেই কমিল না। সেই বায়ুর গুরু নিষ্পেষণে কিছুদিন চাঞ্চল্যের পরে কোথায় যেন সত্যাগ্রহ মিলাইয়া গেল।

সুবিধা হইল না দেখিয়া গান্ধীজী আর এক চাল চালিলেন। তাঁহার চেলাদের দ্বারা ব্যবস্থাপরিষদে Temple Entry Bill-এর অবতারণা করিলেন। বড়লাট উইলিংডন দেখিলেন, বেজায় মজা; অসহযোগের হেড পাণ্ডা গবর্ণমেণ্টের Assembly-তে বিল পেশ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি গ্যাঁট হইয়া বসিয়া রহিলেন। গান্ধীজীর ভক্তেরা সব উদ্গ্রীব হইয়া রহিল—লাটসাহেব বিল আনিতে দেন কি না দেন। লজ্জার মাথা খাইয়া আবার তারের পর তার চলিল—ওগো বড় লাটসাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, অনুমতি দেও, অনুমতি দেও। বেশ খানিকক্ষণ খেলাইয়া, অনেক বটে কিন্তু করিয়া উইলিংডন সাহেব অনুমতি দিলেন। হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, Civil বিদ্রোহীদলের কে আগে গিয়া পরিষদের lobby-তে আসন দখল করিতে পারে—রাজগোপালাচারী, মহাত্মাজীর চেলা, অধুনা বৈবাহিক, তিনি গেলেন—দেবীদাস, মহাত্মাজীর পুত্র, অধুনা রাজগোপালের জামাতা, তিনিও গেলেন। কিন্তু এত তোড়জোড় সত্ত্বেও Temple Entry Bill-এর গুড়ে একেবারে বালি পড়িয়া গেল। সনাতনী পাণ্ডারাও তোড়জোড়ে কিছু কম নহেন, তাঁহাদের চক্রান্তে Bill-টি চাপা পড়িয়া গেল। ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ। আজকাল আর মন্দিরপ্রবেশের হৈ চৈ বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না।

অথচ এই নিতান্ত নিরর্থক ব্যাপার লইয়া মাতামাতি করিবার ফল হইয়াছে এই যে হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরের জনসাধারণ, যাঁহারা

এখনও প্রাচীনপন্থী, যাঁহারা দেবদ্বিজে এখনও বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান্, তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগাতে তাঁহারা নিম্নস্তরের উন্নয়ন আন্দোলনের উপরই ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এবং এই বিরূপতা যদি কতকটা স্থায়ী হয় তবে উচ্চতর শ্রেণীর সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়াতে নিম্নশ্রেণীর সমধিক অনিষ্টেরই কারণ হইবে। অথচ ডাক্তার আম্বেদকর যে কথা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মন্দিরপ্রবেশের অধিকার লইয়া কোন নিম্ন-শ্রেণী মাথা ঘামায় না। এই সব পোষাকী ব্যাপার লইয়া কোন্দল করিবার অবসর তাহাদের নাই। তাহারা তীব্র জীবন-সংগ্রামে বিব্রত; তাহারা চাহে সাংসারিক উন্নতি করিতে। উচ্চশ্রেণীরই বা কয়টা লোক মন্দিরেপ্রবেশের জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে? সম্পূর্ণ অবান্তর ও কৃত্রিম একটা কলহ ও বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজকে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত করা ছাড়া ইহা দ্বারা যে কোন সুফল হইয়াছে এমন ত দেখিতে পাই না।

গান্ধীজীর অভিমানের ও অবিবেচনার অপর ফল যে পুণা-চুক্তি, তাহা দ্বারাও এই দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চস্তরের হিন্দুসমাজ বরাবরই নিম্নস্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মোটামুটি সহানুভূতির চক্ষেই দেখিতেছিল, তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টাও কিছু কম করে নাই। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে নিম্নস্তর উন্নত হইয়া উচ্চস্তরের সঙ্গে সমান পদবীতে আরোহণ করে। কিন্তু হিন্দুসমাজ কখনও চাহে নাই—শুধু হিন্দুসমাজ কেন, জাতির কল্যাণকামী কোন ব্যক্তিই চাহিতে পারে না—যে নিম্নস্তরের লোক বর্ত্তমান অনুন্নত অবস্থাতে থাকিয়াই রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠায় উচ্চস্তরের লোক অপেক্ষাও উচ্চতর পদবীতে কৃত্রিমভাবে অধিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে গান্ধীর প্রায়শ্চিত্তবাদের সার্থকতা হইতে পারে, কিন্তু ইহা সুবিচার নহে, ইহাও অবিচার। যেহেতু

বিগত যুগে নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণীর পাদুকা বহন করিয়া আসিয়াছে, অতএব প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আজ হইতে উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর পাদুকা লেহন করিতে থাকুক—এই ব্যবস্থায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইতে পারে বটে কিন্তু সামাজিক সাম্য ও কল্যাণ সাধিত হয় না। সুতরাং এই অনর্থকর অকল্যাণকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী হিন্দুগণ এখন আন্দোলন করিতেছেন, এবং এই কারণেও উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের হিন্দুদিগের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্যের উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দুসমাজকে vivisection বা অঙ্গচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে প্রচেষ্টার উদয় বলিয়া মহাত্মাজী প্রচার করেন, তাঁহার অবিবেচনার ফলে এই প্রচেষ্টাতে সেই অঙ্গচ্ছেদই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু পুণা-চুক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীর অভিযানও অনিবার্য্য; কারণ ইহা ত শুধু উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের রেষারেষির কথা নহে —যদিও পুণা-চুক্তি-ঘটিত বিতর্কে কথাটা এইরূপই প্রায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহা সমগ্র দেশের ও সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা। দেশের ও সমাজের দাবী করিবার ও প্রত্যাশা করিবার অধিকার আছে যে তাহার শাসনভার উপযুক্ততম প্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত হইবে। ইহাই গণতন্ত্রের একমাত্র সার্থকতা। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যাঁহারা শিক্ষায় বিচক্ষণতায় সামর্থ্যে যোগ্যতম তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইবেন—ইহাই democracy-র আদর্শ। তৎপরিবর্ত্তে যদি এমন ব্যবস্থা রচিত হয় যে নিম্নস্তরের লোক অশিক্ষিত, অজ্ঞ, অপটু থাকিয়াই শাসনতন্ত্র পরিচালনা করে, তবে তাহা যে শুধু উচ্চস্তরের লোকদের অভিমানে বা স্বার্থে আঘাত লাগে বলিয়াই আপত্তিজনক তাহা নহে, সে ব্যবস্থা সমগ্র রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের অশেষ অনিষ্টকর, এমন কি বিপজ্জনক। এহেন ব্যবস্থাকে government by the intelligentsia-র পরিবর্ত্তে government by the ignorantia বলা যাইতে পারে।

আমি জানি আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাঙ্গালা সম্বন্ধে পুণা-চুক্তির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে অনুযোগ করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন :

It is no use quarrelling with me about the 30 Harijan seats in the Bengal Council. I am a cent-per-cent-wallah. I don't mind giving all the seats to the Harijans.

চমৎকার যুক্তি এবং চমৎকার constitution-এর জ্ঞান! কাউন্সিলের seat-গুলি যেন এক একটি মেওয়া, শুধু দাতব্য করিলেই হইল—শুধু যেন কয়েকটি পেন্সনের বন্দোবস্ত, কাজের বালাই নাই, শুধু উপভোগ করা লইয়া কথা—যেন কাউন্সিলের মেম্বরদিগের কোন কর্ত্তব্য নাই, কোন দায়িত্ব নাই, কোন বুদ্ধি বিবেচনা বিচক্ষণতা কোন capacity-র আবশ্যক করে না। Responsible Parliamentary Government বিষয়ে খুব মৌলিক আবিষ্কার বটে! আর এই রাজনৈতিক জ্ঞান লইয়া মহাত্মাজী ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের অন্যতম নির্ম্মাতা হইবার স্পর্দ্ধা রাখেন, এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্ণধার বলিয়া গর্ব্ব করেন। আশ্চর্য্য বটে!

আর যদি গান্ধী মনে করেন যে কাউন্সিলগুলি খেলার সামগ্রী মাত্র, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য বৃত্তি ব্যবসায় উন্নতি অবনতি কিছুই ইহার উপর নির্ভর করে না, তবে তাহার সভ্য কে হইল কে না হইল, স্বতন্ত্রভাবে হইল কি যুক্তভাবে হইল, তাহা লইয়া তাঁহার উপবাস করিবার ও মাতামাতি করিবারই বা আবশ্যকতা কি? রাজনীতি, ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ, এসব যদি তিনি serious জিনিষ মনে করেন, তবে serious ভাবেই ইহার আলোচনা ও আন্দোলন করিতে হয়। রোজ রোজ নূতন নূতন দাওয়াই বাতলান, আজ চরকা কাল লবণ পরশু

হরিজন, কিংবা তাঁহার সব pet theory-র সত্যতা প্রমাণের experiment হিসাবে আন্দোলন পরিচালনা করা এবং স্থগিত রাখা, ইহার কোনটাই শোভন নহে। ইহা ত শুধু খেলার বা খেয়ালের ব্যাপার নহে।

কোন মানুষই অমর নহে, কিন্তু তাহার কর্ম্মফল অনন্ত। ভারতের ইতিহাসে কত বীর, কত যোদ্ধা, কত রাজনীতিজ্ঞ, কত অত্যাচারী, কত বিকৃতমস্তিষ্ক লোকও আবির্ভূত হইয়াছে তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের কার্য্যের ফলধারা পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষ যায়, তাহার কাজও যায়, কিন্তু কাজের ফলপরম্পরা চলিতে থাকে। এই কথা স্মরণ রাখিলে যে কোন সমাজনেতা বা রাষ্ট্রনেতা serious এবং responsible হইতে বাধ্য—বিশেষতঃ সেই নেতা যদি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ববান্ নেতা হন—কারণ তাঁহার কার্য্য ও চিন্তাপ্রণালী দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সে নিয়তি খণ্ডন করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু সেই দায়িত্বজ্ঞানের ও পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞানের যদি অভাব হয় তবে তাহার ফল ভয়াবহ। সেরূপ ক্ষেত্রে,

দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

তাই মনে হয় বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধীর অদ্ভুত ভাববিলাস অসংবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী ও অসংলগ্ন কর্ম্মধারা ভারতকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছে একমাত্র ভারতভাগ্যবিধাতাই তাহা বলিতে পারেন।

ভাদ্র, ১৩৪০।

——:*:——

স্বাধীন ভারতে
আড়াই দিন

স্বাধীন ভারতে আড়াই দিন

এবারকার বড়দিনের ছুটীর সময়ে হাড়ভাঙ্গা শীতের কথা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কেহ ভুলিয়া যান নাই। কলিকাতাতেই হী হী করিয়া কাঁপিতে-ছিলাম, কাজেই রাত্রি ফুরাইলেই হাতে হাতে স্বাধীনতা লাভ করিলে কি রকম লাগে এই অনুভূতিটুকু সঞ্চয় করিবার জন্য দুই একবার পঞ্চনদের তীরে যাইবার আকাঙ্ক্ষা মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারা সত্ত্বেও মনের সেই দুরাকাঙ্ক্ষা মনেই চাপিয়া রাখিলাম, কারণ শরীর মহাশয় একেবারেই নারাজ। যাহা হউক মনে মনে নিজেকে এই প্রবোধ দিলাম, পূর্ণ স্বরাজ যখন ৩১শে ডিসেম্বর নিশীথের পরক্ষণেই ভারতবক্ষে সঞ্চারিত হইবে তখন আর কিছু তাহা লাহোরেই আবদ্ধ থাকিবে না, আমরা কলিকাতাতেও নিশ্চয় সেই স্বরাজের হাওয়া টের পাইব। কাজেই সেই দুর্গম পথে সেই নিশিতা দুরত্যয়া যাত্রায় স্থগিত রহিলাম---আর শুধু নজর রাখিতে লাগিলাম হাওয়া-আফিস হইতে দৈনিক খবরের কাগজ মারফত প্রচারিত temperature-এর figure গুলির দিকে।

অন্য সব test ভুল হইতে পারে কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক meteorological test-এর ত ভুল হইবার যো নাই—ইহা যে একেবারে অব্যর্থ।

পূর্ণ স্বরাজপ্রাপ্তির এই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া নিরাশও হইলাম না—হাতে হাতেই ফল পাইলাম। তাপমান যন্ত্রের পারা স্বরাজপ্রাপ্তির পূর্ব্বসপ্তাহ পর্য্যন্ত কি ভয়ানক sub-normal-এই নামিয়াছিল, ভয় হইতেছিল বুঝি কলিকাতাতেও freezing point অবধি না নামিয়া ছাড়িবে না, ডিগ্রিগুলি মনে হইলে এখনও হৃৎকম্প হয়—৪৭°, ৪৮°, আর ঠিক স্বরাজ ঘোষণার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ৪৯°—আর তারপরে? ঠিক পয়লা জানুয়ারীতে একেবারে ৫৬°। না হইয়া যায় কোথায়? আমাদের স্বরাজ লাভ—কত শতাব্দীর হিমশীতল জমাট পরাধীনতার নিগড় উৎপাটিত করিয়া একেবারে রাতারাতি সহস্রবাঙ্ নিঃসৃত ধ্বনিপটলসংযোগে ব্যোমবিদারী পূর্ণ স্বরাজের আবির্ভাব—ইহাতেও উত্তাপ হইবে না? লাহোর সেদিন যে সাহারায় পরিণত হইয়া যায় নাই ইহাই ত বিচিত্র বোধ হইতেছে।

যাহা হউক, স্বাধীনতার গরমটি বেশ আরাম করিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। পয়লা জানুয়ারী অতিক্রান্ত হইয়া গেল। একটা দিন গণিয়া রাখিলাম—একটা দিন এই চিরপরাধীন জীবনটাকে স্বরাজের উত্তাপে বেশ চাঙ্গা করিয়া রাখিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। ভিতরে উত্তাপ এতটা জমিয়া উঠিয়াছিল যে রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমও হইল না, নানা রকম উত্তপ্ত স্বাধীন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আধভাঙ্গা তন্দ্রা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি কি, একটা হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে বিরাট্ মিছিলের ভিতর, সকলেই যেন সন্ত্রস্ত চিন্তিত; কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে পুলিশে হঠাৎ তাড়া করাতে স্বাধীন ভারতের

প্রধান সেনাপতি আমাদের গক্‌ * ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার এক ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং এই আকস্মিক বিপৎপাতে আমাদের স্বরাজ-চমূর সৈনিকগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে যে যেদিকে পারে সেইদিকে ছুটিতেছে। এই রকম বিপৎপাতে এবং সৈনিকগণের ভীরুতা দর্শনে আমার মনটা স্বপ্নের মধ্যেই কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল—আমিও যে কি করি কোথায় যাই কিছুই ঠিক না করিতে পারিয়া কেমন যেন থ হইয়া গেলাম—আমার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। তবু রক্ষা। জাগিয়াই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। ভাবিলাম, আমি কি idiot! আমার slave mentality যাইবার নহে—স্বপ্নে পর্য্যন্ত আমায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! গক্‌কে আবার পুলিশে তাড়া করিবে কি? ইংরাজের পুলিশ? সে ত ancient history, স্বাধীন ভারতে তাহার স্থান কোথায়? আমাদের এখনকার যে স্বরাজ পুলিশ, তাহা ত গকের অধীনে—তাহারা আবার তাড়া করিবে কি? আর ঘোড়া হইতেই বা গক্‌ পড়িয়া যাইবেন কেন? আমাদের গক্‌ কি ঘোড়ায় চড়েন? তিনি দিব্য ঘাড় বাঁকাইয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন মোটরের উপরে, আমাদের যে modern mechanized army—একেবারে সব motor transport; এখন ত আর সেকেলে সাবেকি cavalry-র রেওয়াজ নাই—অন্য দুই একটা unprogressive দেশে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা স্বাধীন ভারতে সে সব ঘোড়া হাতী ইত্যাদি quadruped army বিদায় দিয়াছি—শেষে কি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া পৈত্রিক প্রাণ বিপদাপন্ন করিব? রাম রাম!

* গক্‌=G. O. C.=General Officer Commanding; ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কলিকাতাকংগ্রেসে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসী সথের সেনার G. O. C. বা গক্‌ সাজিয়াছিলেন।

যাহা হউক, স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, তাহা ত আর বাস্তব নয়—তাহাতে কিছু আজগুবি থাকা বিচিত্র নয়। এতদিনের পরাধীনতাজাত চিন্তার ধারা হঠাৎ কি লোপ পাইতে পারে? একথাটা আপনারা ভুলিয়া গেলে ত চলিবে না যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ কি বিপ্লবের পরে এ স্বরাজপ্রাপ্তি হয় নাই—তাহা হইলে বরং মনের অভ্যাস ধীরে ধীরে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত—আমাদের ত সে সুযোগ হয় নাই (অথবা বলা উচিত আমাদের সে দুর্ভোগে পড়িতে হয় নাই)! আমরা ত এক রজনীর দ্বিতীয় যামান্তে বিশুদ্ধ will-power এবং lung-power-এর সাহায্যেই স্বরাজ লাভ করিয়াছি। তাই বাস্তবকে যদিও বা আয়ত্ত করিয়াছি, স্বপ্নলোককে এখনও জয় করিতে পারি নাই। আরও কিছুদিন স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে প্রাণধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই স্বপ্নেও স্বরাজ mentality দোরস্ত হইয়া যাইবে। তাই উপরিবর্ণিত স্বপ্নদোষের নিমিত্ত বিশেষ ঘাবড়াইবার প্রয়োজন দেখি না।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ত উঠিয়া পড়িলাম, আর ঘুমাইতে প্রবৃত্তি হইল না, মনে পড়িল কবির সেই বজ্রনির্ঘোষ বাণী, সেই নিদ্রাব্যাঘাতকর হুঙ্কার "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"। কত দীর্ঘ বর্ষ, কত অগণিত শতাব্দী আমরা ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি, আর নয়; এবার রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে, নিদ্রা জয় করিতে হইবে, আমাদের সকলকেই এক একটি আস্ত গুড়াকেশ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, নহিলে হয়ত কুম্ভকর্ণের বর্ষান্তজাগরণের পরে আবার চিরনিদ্রাই নবলব্ধ স্বাধীন ভারতের ললাটলিপি হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব নিদ্রা পরিহার করিলাম, horizontal অবস্থা পরিত্যাগ করিলাম, এবং ইজিচেয়ারখানি টানিয়া গায়ে পায়ে ভাল করিয়া রাগখানা জড়াইয়া (স্বাধীন হইলেই কি আর পৌষ মাসের শীত এক ধাক্কায় যায়?) slanting অবস্থায় বসিয়া রহিলাম নব অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায়। আর সবই ঠিক অবস্থায় রহিল, কিন্তু মাথা খাড়া রাখিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে লাগিল,

সেটি শুধু ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতে চায়। ইহাও সেই পাপাত্মা ইংরাজদের কারচুপি—সেই ইংরাজ নিউটন Law of Gravitation বিধিবদ্ধ করিয়াছিল বলিয়াই ত এই ফ্যাসাদ! আচ্ছা ইহার কি একটা বিহিত করা যায় না? এই পূর্ণ স্বাধীনতার দিনেও কি এই সব অত্যন্ত objectionable আইনের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে? আমার ত মনে হয় আইন অমান্য করিতে হইলে এই সব বে আইনী আইন —lawless laws—লইয়াই সুরু করা উচিত।

অনেকক্ষণ এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বিধি অমান্য করিবার প্রয়াস করিতে করিতে এবং ঝিমাইতে ঝিমাইতে রাত্রি কাটিল (ঝিমান ত নিদ্রা নহে এবং ঝিমান সম্বন্ধে কোন কবি কোন নিষেধাজ্ঞা প্রচারও করেন নাই)। স্বাধীন যুগের দ্বিতীয় দিনের সূচনা হইল। এদিনটির বিশেষ ইতিহাস দিবার আবশ্যকতা নাই—তবে কলিকাতায় উত্তাপ বাড়িতেই লাগিল। আর এক রাত্রিও কোন মতে কাটিল। পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনও প্রায় শেষ হয় হয়, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—আমার মনে ভরসা হইতেছে আজকার রাত্রি যদি নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে কাটিয়া যায় তবে আর ভয় নাই, কারণ ত্রিরাত্রি নির্ব্বিবাদে কাটিলে নব-জাতকের আর কোন আশঙ্কা থাকে না। বলিতে লজ্জা হইতেছে যে মনের এক কোণে একটু ভয় তখনও সঞ্চিত ছিল—এতদিনের দাস-মনোভাবের nervousness, হঠাৎ যাইবে কোথায়? তাই তেরাত্তিরের অপেক্ষায় ছিলাম।

যাহা হউক, সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া গড়ের মাঠে একটু স্বাধীনভাবে হাওয়া খাইতে যাইব মনঃস্থ করিতেছি এমন সময়ে আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। কাজেই আমার সান্ধ্যভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া বন্ধুর অভ্যর্থনায় মনোনিবেশ করিতে হইল। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পরে যে কথাটা আমার মনের উপরিভাগে টগ্‌বগ্‌ করিতেছিল

তাহা আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না, বন্ধুকে সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম,

"মশাই, কি রকম লাগছে? আজকে ত আড়াই দিন স্বাধীনতা উপভোগ করছি। কেমন বোধ করছেন?"

বন্ধুবর বলিলেন, "স্বাধীনতা উপভোগ করছি কি রকম? স্বাধীন হলুম কবে?"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম; বলিলাম, "বাঃ, স্বাধীন হলুম কবে মানে? এই ত সেদিন ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের নিশীথাবসানে ইংরেজের নববর্ষ ইংরেজের তোপসহযোগে যেই সূচিত হল অম্‌নি আমাদের কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট জাহিরলাল স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন; Union Jack ভস্মসাৎ হল, এবং তৎস্থলে চরকা-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ স্বাধীন ভারতের পতাকা পত্‌পত্‌-রবে উড্ডীন হ'ল, আর আকাশ বাতাস কম্পিত করে অযুতকণ্ঠে নিনাদিত হ'ল

"ইন্‌খিলাপ জিন্দাবাদ্‌।"

আর মস্কো থেকে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল সে নির্ঘোষে। মার্কিন দেশের Senator Blaine তাঁদের রাষ্ট্র পরিষদে নোটিশ পর্য্যন্ত দিয়ে ফেলেছেন যে বিনা বিলম্বে ভারতের স্বাধীনতাকে recognize করিতে হবে। আর আপনি বলেন কিনা স্বাধীন হলুম কবে? খবরের কাগজ না পড়েন হাওয়াও ত গায়ে লাগে—তাতেও কিছু মালুম করতে পারেন না? স্বাধীন হওয়ার পর temperature পর্য্যন্ত কি রকম rise করেছে দেখেছেন? এত ব্যাপারের পরও আপনি আকাশ থেকে পড়লেন। বেশ লোক ত আপনি?"

বন্ধু অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "বেশ লোক আমি না তুমি! খুব ত খবরের কাগজ পড়েছ দেখছি। আরে পূর্ণ স্বরাজ ত হ'ল objective।"

আমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম ; বলিলাম, "Objective ! বলেন কি ? তবে কি কিছুই হয়নি বলতে চান ? আমি যে এই আড়াই দিন ধরে অত্যন্ত subjective ভাবে অনুভব করছি যে পূর্ণ স্বরাজ এসে গেছে। আর Senator Blaine ?"

অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে বন্ধুবর বলিলেন, "রেখে দাও তোমার Senator Blaine। আর যাই হোক্ তোমার ব্লেন সাহেবের ব্রেণের তারিফ আমি করতে পারছিনে। তবে কি জান, ভাবতে গেলে তারই বা দোষ কি ? আমাদের পাণ্ডাদের যে রকম আস্ফালন, তোমাদের সাবাস্ বোসের parallel government-এর যে বহর—এ দেখে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে সে বেচারা নিরীহ ভদ্রলোক ভেবে বসেছে যে একটা Fourth of July-এর নয়া সংস্করণই বুঝি বা। তা তারই বা দোষ কি ? সে ত আর বুঝতে পারেনি যে স্বাধীন ভারতের বড় বড় লড়নে-ওয়ালাদের অগ্নিবাণ হচ্ছে চিত্তপ্রদাহকারী বাণী, বায়ুবাণ হচ্ছে কর্ণপটহ-ভেদকারী নিনাদ, বরুণবাণ হচ্ছে হৃদয়দ্রবকারী নেত্রনীর, এবং সম্মোহনবাণ হচ্ছে মহাত্মা-patent অমোঘ চরকার মৃদুগুঞ্জন। তাই সে নোটিশ দিয়েছে Independent India-কে recognize করতে। এ আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? কিন্তু আসলে ত দেখছ কোথায় বা India, কোথায় বা Independence, আর কোথায় বা তার recognition ? এত বড় বিশ্বত্রাসকারী ফাঁকা আওয়াজ পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।"

আমি বন্ধুবরের এবংবিধ বাক্যাবলীতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম। তবু স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতার আমার অন্ত ছিল না ; তাই বুকে বল বাঁধিয়া আবার বলিলাম,

"বলেন কি, ফাঁকা আওয়াজ ! যেন ফাঁকা আওয়াজটা কিছু নয় ! বলি মশাই, বিজ্ঞান-শাস্ত্রটা একটু ওল্টানো হয়েছে কোনদিন ? এ সম্বন্ধে

কথাটা বুঝলেন না, ফাঁকা না হলে কখনও আওয়াজ হতে পারে? ইংরেজরাও ত এখনও একথা অস্বীকার করতে পারেনি; প্রমাণ তাদের প্রবচন, The empty vessel sounds much। একেবারে solid নিরেট বস্তুর থেকে কখনও আওয়াজ বেরোয়? শুনেছেন কখনও? Vibration সৃষ্টি করতে হলে, জাতির প্রাণে প্রাণে স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে হলে চাই ফাঁকা, চাই আওয়াজ। আপনি অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ করলেই আওয়াজটা তুচ্ছ হয়ে যায় না। আজকাল একটা রব উঠেছে যে এখন আর কথার সময় নেই, কাজের সময় এসেছে। এ রকম nonsensical কথা এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণগোচর হয় নি। আরে, দেশের কাজ আবার কি, কথাই ত কাজ; আরও জোরে কাজ চালাতে চাও তবে জোরে দরাজ গলায় দাও দেশের ডাক। সে ডাক একেবারে কাণের ভেতর দিয়ে মরমে পশবে—আর যদি সহজে না পশে তবে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা নিয়োগ কর, আর কোন ভাবনা থাকবে না, দেশের ডাক একেবারে কর্ণপটহ ভেদ করে ভেতরে গিয়ে ঢুকবে। লাহোরে সব ফাঁকা আওয়াজ হয়েছে বলে সব আপনি অম্‌নি উড়িয়ে দিলেই হল! শব্দের শক্তির কোন খোঁজ রাখেন? শব্দশক্তিই হচ্ছে আসল প্রকাশিকা। এতেই সব জিনিষ প্রকাশ করে দেয়। আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে—শব্দ ব্রহ্ম। কথাটা ত মিথ্যে নয়। বাইবেলেও লিখেছে, In the beginning there was the Word; জগতের আদি মূলীভূত কারণই হচ্ছে Logos। দেখুন এই শব্দমাহাত্ম্য বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কি রকম ঐকমত্য। না হবে কেন? সত্য কি কখনও চাপা থাকে? আপনাদের মত যাদের slave mentality তারাই শুধু কাজ কাজ করে মরে—এই গ্রামে গ্রামে যাও, দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন কর, পীড়িতের সেবা কর, মূর্খকে জ্ঞান দাও, শিক্ষাপ্রচার কর, ব্যবসা বাণিজ্য করে দেশের ধনবৃদ্ধি কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। যত সব absurd unprac-

tical programme—এই সব যাঁতাঠেলা হাতাঠেলা প্রোগ্রামে কোন দিন কোন দেশ স্বাধীন হয়েছে দেখেছেন? এ সব নির্ঘাত political suicide। আরে বাপু, গ্রামে যে গিয়েছে সে মরেছে—এত কলেরা মালোয়ারী জ্বর প্রভৃতি মহামারীগ্রস্ত গ্রামে যাওয়া কি কোন ভদ্রলোকের পোষায়? যা পোষায়, যা করা সঙ্গত, যা করা সভ্যতানুমোদিত, যাতে হাতে হাতে ফল দেয়, তা হচ্ছে বক্তৃতা—কংগ্রেসে বক্তৃতা, কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা, কাউন্সিলে বক্তৃতা। সেই জন্য আমার লাহোরী কংগ্রেসের একটা বিষয় ভাল মনে হচ্ছে না; সেটা হচ্ছে এই যে বক্তৃতার একটা বড় পীঠস্থান বর্জ্জন করতে বলা হয়েছে—অর্থাৎ কাউন্সিলগুলো। এটা নিছক ওই চরকা-পাগলার খেয়াল। আরে, এ বুদ্ধিও বুড়োর হল না যে স্বাধীনতালাভের অহিংস উপায় একমাত্র যখন বক্তৃতা, তখন সেই বক্তৃতার কোন ঘাঁটী কি ছেড়ে আস্‌তে আছে? বোকা আর কি? সে বুড়োর চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধি রাখেন যাঁরা অর্থাৎ আমাদের কিষ্কিন্ধ্যার politician-রা, তাঁরা ঐ ভুলটা ধরে ফেলেছেন এবং তার প্রতি-বিধানও বিধিমতে করতে ত্রুটী করেছেন না। যা হোক্ এ হল একটা ছোট কথা—বড় লড়াইয়ের ভেতরে ওরকম ছোটখাট tactical mistake হয়েই থাকে; ওতে বড় একটা আসে যায় না, শুধরে নিলেই হল। আসল কথা হচ্ছে, main strategy-তে ভুল না হলেই হল—সেদিকে আমরা ঠিক আছি। যে শব্দভেদী বাণ আমরা আবিষ্কার করেছি তার সন্ধান একেবারে অব্যর্থ। কৈ, এখন যে টুঁ শব্দটি বড় করছেন না? শব্দের মাহাত্ম্য মানবেন না! জানেন না বাইবেলে Walls of Jericho কিসের জোরে পপাত হয়েছিল? তাতে কি কামান-গোলা-গুলি লেগেছিল? তা লাগেনি। শুধু শব্দের জোরেই, এক তূর্য্য-নিনাদেই জেরিকো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর এই সামান্য ইংরেজের রাজত্ব বিধ্বস্ত হবে না?"

আমার কথার তোড়ে বন্ধুর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; আমাকে দম লইতে দেখিয়া নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন,

"বাপ্‌, টুঁ শব্দ কর্‌ব তার সাধ্য কি? তোমার বাক্যবাণে আমি ত আচ্ছন্ন হয়েই পড়েছি। তবে এ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে আর ফল কি? পরম পরিতাপের বিষয় এই যে unimaginative, sentiment-বর্জ্জিত ম্লেচ্ছ ইংরেজরা তোমাদের শব্দব্রহ্মের এই অপার মহিমা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারলে না। তারা অন্য দেশের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার কিছু কিছু খবর রাখে; নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে নিজেরা সংগ্রাম করেছে, আবার অন্যের স্বাধীনতা ব্যাহত করবার জন্যেও লড়াই করেছে। তারা জানে স্বাধীন হতে গেলে Oliver Cromwell চাই, George Washington চাই, অন্ততঃ পক্ষে একটা Mazzini কি Garibaldi কি Cavour-ও চাই। আমাদের মত ত তারা এত বুদ্ধিমান্ হয়ে ওঠে নি। তারা বুঝতে পারেনি যে ওসব Cromwell, Washington, Garibaldi ছিল সব গাড়োল, আকাট মূর্খ, মিছিমিছি সারাটা জীবন ছট্‌ফট্‌ করে মরেছে for nothing। আমরা দেখ দেখি কেমন স্বাধীনতা লাভের একটা made easy পন্থা আবিষ্কার করে ফেলেছি—একেবারে স্বরাজের নববিধান—এ নৈলে আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতের বৈশিষ্ট্য কোথায়? আমরা will-power-এ সব গড়ে তুলতে পারি, শব্দশক্তিতে সব তয়ের করতে পারি, একেবারে—Let there be light and there was light—আর কি? এস, সমস্বরে চীৎকার করে আমরা নিনাদ করে উঠি, "Let there be complete independence,"—তারপরে complete independence না এসে যায় কোথায় দেখি? দুঃখের বিষয় তোমাদের এত সাধের এই Subjective Swaraj-এর মাহাত্ম্য ঘোর জড়বাদী পাষণ্ড ম্লেচ্ছগুলো বুঝলে না। ঘোর কলি! ঘোর কলি!"

লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, আর বুক বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না, বন্ধুবরের এই বিদ্রূপবাণে কেমন যেন একেবারে মুষড়িয়া পড়িলাম। আহাহা, আমার এত সাধের স্বাধীন ভারত আড়াই দিনেই ঝরিয়া পড়িল, তেরাত্রিও কাটিল না; মনের কোণে যে ভীতিটুকু লুকাইয়া ছিল সেই টুকুই ফলিয়া গেল। বন্ধুকে হতাশভাবে বলিলাম,

"বন্ধু, আপনি জানেন না আমার হৃদয়ে কি দাগাই আপনি আজ দিয়ে গেলেন! আমার অন্তরাত্মা স্বাধীনতার উত্তাপে বেলুনের মত ফুলে উঠেছিল, আপনি খোঁচা দিয়ে যা prick করে দিয়েছেন এতে যে একেবারে চিম্‌সে এতটুকু হয়ে গেছে। আহাহা! মনটাই আমার একেবারে দাবিয়ে দিলেন।"

বন্ধুবর বলিলেন, "এখন কি করবে ভাবছ?"

আমি বলিলাম, "আর করাকরি! ভারত-উদ্ধারই ভেস্তে গেল। মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। চলুন মশাই মনটাকে একটু চাঙ্গা করে আসা যাক্।"

"কোথায় যাবে?"

"চলুন বায়স্কোপে যাই। Globe-এ ভাল Film আছে—all-British—Piccadilly—তাই চলুন দেখে আসি।"

মাঘ, ১৩৩৬।

-:*:-

পুনরুক্তি

পুনরুক্তি

অনেকেই বোধ করি ফরাসী মনস্তাত্ত্বিক মঁসিয়ে কুয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। প্রাচীন মন্ত্রশক্তির তিনি একজন অতি-আধুনিক প্রবক্তা, এবং শুধু প্রবক্তা নহেন তিনি হাতে কলমে মন্ত্রশক্তির একজন প্রযোক্তা। তিনি তাঁহার মন্ত্রশক্তির বলে বা power of suggestion দ্বারা অনেকের অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রের মারফতে শুনিতে পাই। মূককে বাচাল করিয়াছেন কিনা শুনি নাই, কিন্তু বিবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত অনেক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার প্রণালী খুব সহজ। রোগী তাঁহার নিকটে আসিয়া রোগের বিষয় বর্ণনা করিলে তিনি তাঁহাকে এই মন্ত্র জপ করিতে ও ধ্যান করিতে দেন, "আমার রোগ নাই; আমি সুস্থ; আমি সবল।" আর রোগীও স্বাস্থ্য ও সবলতা ও নীরোগতার ধ্যান করিতে করিতেই অচিরাৎ সুস্থ

সবল ও নীরোগ হইয়া ওঠে। এই প্রকার পৌনঃপুনিক জপের প্রভাব শুধু মনের উপরেই আবদ্ধ থাকে না, মন হইতে দেহের স্নায়ুতে শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত দেহমনের ভিতরে এক নবীন ভাব আনিয়া দেয়। পাশ্চাত্য দেশে মঁসিয়ে কুয়ের এই প্রণালী চারিদিকে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে এই প্রণালীর নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে—Coue-ism।

একই কথা বার বার আবৃত্তি করা, একই ভাব অবিরত পোষণ করা, একই চিন্তার দ্বারা পুনঃ পুনঃ মস্তিষ্ককে আলোড়িত করায় লোকের ভাল হয় কি মন্দ হয় সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কারণ ভাল কিংবা মন্দ সেই চিন্তাধারার উপকারিতা কিংবা অপকারিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভালই হউক কিংবা মন্দই হউক, ফল যে একটা গুরুতর রকম হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই পুনরুক্তি বা মন্ত্রজপের প্রভাব ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষেও যেমন প্রবল, সমষ্টিগত মানুষের পক্ষেও তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। এক একটা ধারণা সমাজকে একবার পাইয়া বসিলে এমন ভাবেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে তাহার হাত এড়াইয়া একটু স্বচ্ছ মুক্ত বাতাসে ফিরিয়া আসা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়, তা সে ধারণা ধর্ম্ম বিষয়েই হউক, কি ঐতিহাসিক বিষয়েই হউক, কি রাষ্ট্রীয় বিষয়েই হউক। এই সামাজিক Coue-ism সত্যই এক বিষম ব্যাপার। একই theory-র পুনরাবৃত্তি, একই চিন্তাধারার জপসাধনা সামাজিক মনকে এমনই পঙ্গু ও জড় করিয়া ফেলে যে সত্যমিথ্যার মাপকাঠি আর তাহার ঠিক থাকে না, এমন কি সত্যমিথ্যার মাপকাঠি আবিষ্কার করিবার মত উৎসাহও তাহার আর থাকে না। বারংবার যে কথা যে সিদ্ধান্ত যে কাহিনী শুনিয়া আসা যাইতেছে তাহাই চরম সত্য বলিয়া

জনসাধারণ নির্ব্বিকারে মানিয়া লয়। বাইবেলে লেখা আছে যে পাইলেট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সত্য কি ?" এবং তাহার উত্তরের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করেন নাই। কিন্তু crowd-psychology অনুসারে ইহার উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। উত্তরটি এই যে মিথ্যা অজস্রবার পুনরুক্ত হইলেই সত্য হয়—a lie infinitely repeated becomes the truth। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নেহাৎ মিথ্যা বলেন নাই,

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

অন্য সমাজের কিংবা দেশের কথা ছাড়িয়াই দিই। আমাদের নিজেদের দেশ ও সমাজে প্রচলিত কতিপয় মতামত একটু আলোচনা করিলেই পুনরুক্তির প্রভাব কি প্রবল তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কিছুকাল ধরিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে ইউরোপীয় জাতির প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। বিগত দ্বিশতবর্ষমধ্যে ইউরোপীয় জাতিগুলি এতটা কার্য্যক্ষম ও শক্তিমান্ হইয়াছে যে ইউরোপ ছাড়াও পৃথিবীতে যে সমস্ত ভূখণ্ড আছে তাহার বহুস্থানে আদিম অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহারা বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যথা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং অন্যান্য বহুস্থানে বসবাস না করিলেও সেই সেই দেশের অধিবাসীদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে, যথা আফ্রিকার অন্যান্য অংশে ও এশিয়ার অনেক দেশে। শুধু যে বাহুবলেই তাহারা প্রাধান্য দেখাইয়াছে তাহা নহে, মানসিক বল, বিজ্ঞানলিপ্সা ও মনীষাতেও ইউরোপীয় জাতিগুলি খুবই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। বিগত দুই শতাব্দীতে এই যে ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা সত্য, ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু এইটুকুমাত্র সত্যের উপর নির্ভর করিয়া যে বিস্তৃত বিশাল বিরাট্ theory গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পরম বিস্ময়কর। মানবজাতি আজকার নহে; এবং মানব সভ্যতাও কম দিনের নহে;

ঐতিহাসিক যুগই অক্লেশে অন্ততঃ দশসহস্র বৎসর ধরা যাইতে পারে; এবং যতই নূতন নূতন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতেছে ততই মানবজাতির ও সভ্যতার প্রাচীনতার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মানবজাতির লক্ষ লক্ষ বৎসরের অস্তিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও এবং ইতিহাসলভ্য মানবসভ্যতার অস্তিত্বের পরিমাণ দশসহস্র বৎসর ধরিয়া লইলেও, তাহার তুলনায় দুই তিন শতাব্দীকাল কতটুকু—কালসমুদ্রে বুদ্বুদমাত্র। কিন্তু এই সামান্যকালব্যাপী সামান্য ঘটনাবিপর্য্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া কি সব প্রচণ্ড theory খাড়া হইয়াছে!

এই দুই শতাব্দীর সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন, ইয়ুরোপীয়গণের রকমই আলাদা; ইউরোপের শ্বেতাঙ্গগণ একবারে superior race; পৃথিবীর অধিবাসী অন্যান্য অ-শ্বেত জাতি অপেক্ষা তাহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানে, মনীষায়, বাহুবলে, তেজস্বিতায়, কষ্টসহিষ্ণুতায়, সাহসে, ধৈর্য্যে, সর্ব্বপ্রকারেই শ্বেতাঙ্গগণ শ্রেষ্ঠ; এবং জাত্যংশে বা racially শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাহারা এত উন্নত হইয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া অন্য জাতি পারিবে কেমন করিয়া? ভগবান্ যে অন্য জাতিদিগকে মারিয়া রাখিয়াছেন; তাহারা যে racially inferior; তাহাদের অদৃষ্টে আছে শুধু শ্বেত জাতির দাসত্ব করা অথবা কোনমতে কায়ক্লেশে শ্বেত জাতির অনুগ্রহকণিকা আহরণ করিয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়া; এতদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তাহারা হইল white man's burden। এই burden যে ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া না দিয়া শ্বেত জাতি বহন করিতে রাজী হইয়াছে ইহাই burden-দিগের পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া লইতে হইবে। অ-শ্বেত জাতিরা যে বাঁচিয়া আছে এই ঢের, তাহাদিগকে শ্বেত জাতিরা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেই বা কে কি করিতে পারিত?

এই theory শতবর্ষাধিককাল ইউরোপীয়দিগের মুখ হইতে এতবার এত রকমে শুনিয়া আসিতেছি যে শুধু ইউরোপীয়দিগের মনে কেন, আমাদের মনেও ইহা একপ্রকার বদ্ধমূলই হইয়া গিয়াছে। পুনরুক্তির বলে মন্ত্রের শক্তিটি এমনই কার্য্যকরী হইয়াছে যে আমাদের শত জাতীয় আন্দোলনের অন্তরালে, শত স্বরাজ প্রচেষ্টার তলদেশে এই করুণ কাতরতার ধারা ফল্গুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া প্রবহমান রহিয়াছে যে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমরা গায়ের জোরে পারিয়া উঠিব না, উহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তবে চেঁচামেচি করিয়া, ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, উহাদেরই প্রচারিত স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া, উহাদিগকে লজ্জা দিয়া, উহাদের বিবেককে জাগ্রৎ করিয়া যতটা করিতে পারি তাহাই লাভ। তাই একদিকে petition আর একদিকে non-violent non-co-operation, ইহারই মধ্যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অভিযান নিবদ্ধ।

আজ অবস্থার ফেরে পড়িয়া ভারতবর্ষ ইংরাজের রাজত্বের অধীনে থাকায় ভারতীয় জাতিসমূহের তুলনায় শ্বেত জাতিদের সামরিক শক্তি এবং কর্ম্মশক্তি শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে বটে, এবং গত দুই শত বৎসরের অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সাধারণভাবে অ-শ্বেত জাতি হইতে শ্বেত জাতি প্রবলতর হইয়া থাকিতে পারে বটে; কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেখিতে গেলে এই প্রভেদ কি চিরন্তন? এই প্রভেদ কি জাতিগত? শ্বেত জাতি কি জাত্যংশে বা racially শ্রেষ্ঠ? ইতিহাস ত সে সাক্ষ্য দেয় না।

সাধারণ মানুষের অবশ্য স্বভাব এই যে বর্ত্তমান অবস্থাকেই তাহারা চিরস্থায়ী মনে করে; ইহার অন্যথা বড় একটা কল্পনা করিতে পারে না; যেমন আমরা ভারতবর্ষে শতবর্ষাধিককাল ইংরাজের শাসনাধীনে থাকাতে ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ যে কি প্রকার হইতে পারে তাহা ভালরকম

কল্পনাই করিতে পারি না (যদিও আমাদের দেশের কোন কোন অংশে ইংরাজরাজত্ব এখনও শতবর্ষ হয় নাই —যথা পঞ্চনদে ৮০ বৎসর এবং ব্রহ্মে ৪৫ বৎসর মাত্র); এবং যেমন তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর ও সাজাহান বাদশাহের আমলে লোকেরা মোগলসাম্রাজ্যের তিরোভাব কল্পনা করিতে পারিত না। সাধারণ মানুষের এই মনোবৃত্তির উপরই এই সমস্ত theory শুধু পুনরুক্তির প্রভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম। এই যে আজ এত বড়, এত শ্রেষ্ঠ, এত জাত্যংশে উচ্চ বলিয়া প্রচারিত শ্বেত জাতি—এতদিন ইহারা কোথায় ছিল? বহুপ্রাচীন ইতিহাসের ভিতরে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা দেখি না—মিশর সুমের বাবিলন ইলাম দ্রাবিড়ের সভ্যতার কথা নাই তুলিলাম। গ্রীস-পারস্য সমরকাহিনী হইতেই আরম্ভ করা যাউক। সেই সময়ে গ্রীস আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়ায় এবং পারস্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতার অকাট্য প্রমাণ দেখিতে পাইয়া পরম উল্লসিত হইয়াছেন। কিন্তু যে মারাথন ও থার্ম্মপিলীর যুদ্ধের কাহিনীতে গ্রীসের বিজয়বার্ত্তায় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ অজ্ঞান—সেই সব যুদ্ধ গ্রীসের পক্ষে জীবনমরণের ব্যাপার বটে, কিন্তু পারস্যের পক্ষে কি ছিল? সামান্য frontier war মাত্র। সেই frontier skirmish-এ প্রত্যাহত হইয়া পারস্য-সাম্রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি সামান্যই হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে পারস্য-রাজধানী হইতে দুইসহস্র মাইল দূরে এই সব যুদ্ধ হইয়াছিল; এবং পারস্যের ছিল offensive, গ্রীসের ছিল defensive। এবং আরও মনে রাখিতে হইবে যে এই পারস্যেরই পূর্ব্বতন সম্রাট্ Darius ইউরোপের সমস্ত বল্কানপ্রদেশ এবং রুশের ক্রিমিয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের শ্বেত জাতির বাহুবলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না।

সত্য কথা বলিতে কি, সেই প্রাচীনকাল হইতে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যত বাহুবলের পরীক্ষা হইয়াছে, সব কয়টাতেই প্রাচ্য বিজয়ী, পাশ্চাত্য শ্বেত জাতি বিজিত। ইহার একমাত্র exception দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার। তবে আলেকজাণ্ডারের ন্যায় বিশ্ববিজয়ী genius-এর কথা স্বতন্ত্র; প্রাচ্যেও সেই রকম genius যে জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহা নহে—উদাহরণস্বরূপ চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাছাড়া, যদি আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধে পুরুর পরাজয়ে প্রতীচ্য শ্বেত জাতির সামরিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়, তবে সেলিউকস ও চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধে সেলিউকসের পরাজয়ে প্রাচ্যের সামরিক শ্রেষ্ঠতা তুল্যরূপেই প্রতিপন্ন হয়। কাজেই আলেকজাণ্ডারের কথা ছাড়িয়া দিই। আর রোমসাম্রাজ্যের সহিত সমসাময়িক প্রবল কোন প্রাচ্য জাতি ভারত কি চীন কি পারস্য ইহাদের বিশেষ কোন সংঘর্ষ ঘটে নাই। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে সাধারণতঃ প্রাচ্যই বিজয়ী এবং in the offensive, আর পাশ্চাত্য বিজিত এবং in the defensive।

দুই একটা উদাহরণ দিলেই বক্তব্য সুপরিস্ফুট হইবে। মধ্য-এশিয়া হইতে বিনির্গত হূণ-গথ-ভাণ্ডলদিগের দ্বারা প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের ধ্বংসের কথা ছাড়িয়াই দিই। তৎপরবর্ত্তী কালে প্রাচ্যদেশবাসী কর্ত্তৃক ইউরোপ আক্রমণেরই বড় বড় কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। একটি হইতেছে সপ্তম শতাব্দীর আরব অভিযান, যে অভিযানের ফলে মহম্মদের মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, সমস্ত স্পেন ও অর্দ্ধেক ফ্রান্স আরবদিগের করতলগত হইয়াছিল। আর সেই যুগে শুধু যে বাহুবলেই আরবগণ শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, সভ্যতা ও মনীষা ও culture-এর শ্রেষ্ঠতার বলে আরবগণ সমরকন্দ, বাগদাদ, দামাস্কাস হইতে কর্ডোভা গ্রানাডা পর্য্যন্ত যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই মধ্যযুগে জ্ঞানালোক

প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিল; এবং আজকাল যেমন প্রাচ্য দেশীয়েরা লণ্ডন, বার্লিন, পারীতে অধ্যয়ন করিতে যান, তৎকালে সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশীয়েরা কর্ডোভা গ্রানাডা কাইরোতে বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইতেন। ইউরোপের নবযুগের বা renaissance-এর গোড়াপত্তনই হইল আরবদিগের শিক্ষা ও সভ্যতার ভিত্তির উপরে। Algebra, Alchemy প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্যার আরবী নামগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা বেশী দিনের কথা নয়। এই আরব সভ্যতার প্রভুত্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল—পাঁচশত বৎসরের অধিককাল। তখনও এই জাত্যংশে "শ্রেষ্ঠ" শ্বেত জাতিই ইউরোপে বসবাস করিত, কিন্তু পৃথিবীর অন্য ভূভাগের কথা ছাড়িয়াই দিই খোদ ইউরোপেও তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

তারপর জগতের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঙ্গল অভিযান। চীনের উত্তরস্থিত কারাকোরম প্রদেশ হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া মঙ্গলজাতি কি যুগপ্রলয় সংগঠন করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়-বিমূঢ় হইতে হয়। সেই অভিযানের নেতা ছিলেন অদ্বিতীয় জননায়ক চেঙ্গিস খাঁ—এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি যে চেঙ্গিস খাঁ মুসলমান ছিলেন না; চীনের রাজাদিগের উপাধি ছিল খাঁ। এই মঙ্গল অভিযানের ফলে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে যে বিরাট্ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর অন্যদিকে ইউরোপখণ্ডে সমগ্র রুশ ও পোলাণ্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই সে সময়কার একটা কথা প্রচলিত আছে—Not a dog could bark in Poland without word from Cathay। পিকিংএর Great Khan অথবা রাজাধিরাজের Viceroy বা প্রতিনিধিগণ এক এক দেশ শাসন করিতেন। ইউরোপীয় রুশ এই রকম একজন Viceroy-এর অধীন ছিল; একদিন দুইদিন নয়, পুরা দুইশত বৎসর

রুশরাজ্য মঙ্গলদিগের অধীন ছিল। এই মঙ্গল অভিযানের সময়েই প্রথম বারুদ বা gun-powder মঙ্গলদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। মঙ্গলদিগের নিকট হইতেই ইউরোপীয় শ্বেত জাতি বারুদের প্রয়োগ শিক্ষা করে। এই মঙ্গল সম্রাজ্যেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রথিতনামা সম্রাট্ ছিলেন কুবলাই খাঁ—ইঁহারই রাজসভায় বিখ্যাত ইতালীয় পর্য্যটক Marco Polo বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে চীনদেশের printing ও paper money দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন, কারণ তখন ইউরোপে এসকল কিছুরই প্রচলন ছিল না।

ইহার পরে মানব-ইতিহাসের বড় ঘটনা এই মঙ্গলদিগেরই অন্যতম শাখা তুর্কদিগের দ্বারা ইউরোপ আক্রমণ—পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনা। সেই আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্যের প্রাচ্য শাখা—যাহাকে Greek অথবা Byzantine Empire বলিত এবং বল্কান প্রদেশে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছিল—সেই সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে বিশ্ববিশ্রুত কনষ্টান্টিনোপল তুর্কদিগের করকবলিত হয়। তুর্কের সে প্রচণ্ড আক্রমণ শুধু বল্কান প্রদেশ অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাচীন Holy Roman Empire বা জার্ম্মান সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; এবং রুশের দক্ষিণ ভাগে ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। ইহা মোটে সাড়ে তিনশত বর্ষ পূর্ব্বেকার ঘটনা।

স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই যে তুর্ক-আক্রমণের পরে ইউরোপের renaissance-এর ফলে, ধর্ম্ম ও অন্ধবিশ্বাসের ঠুলি ইউরোপের মনশ্চক্ষুর উপর হইতে উঠিয়া যাওয়ায় অভাবনীয়রূপে জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাধ অনুশীলনের দরুণ ইউরোপে বিগত তিন শতাব্দী ধরিয়া নবজীবনের আবির্ভাব হইয়াছে। এবং এই সময়টা প্রাচ্য একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; প্রাচ্যদেশীয়েরা ধর্ম্ম ও অন্ধসংস্কারের আওতায় কতকটা নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে;

এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হইবার তাহাই এই দুই শতাব্দীতে ঘটিয়াছে অর্থাৎ প্রাচ্যের পরাজয় ও প্রতীচ্যের জয়। কিন্তু এই সাময়িক জয়ের মূলে কোন জাতিগত শ্রেষ্ঠতা নাই।

বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যের নবজাগরণের ইতিহাসও এই সত্যই প্রতিপন্ন করিতেছে। প্রাচ্যদেশীয়েরা দুই শতাব্দীর হীনতায় ক্ষুব্ধ হইয়া যখন নূতন করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে সচেষ্ট হইল, নূতনভাবে আধুনিক যুদ্ধোপকরণ সমর-কৌশল শিক্ষা করিয়া নিপুণ হইয়া উঠিল, অমনি আবার তাহারা নিজেদের সুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পাইল। তাই আজ রুশের উপরে জাপানের জয়লাভ, গ্রীসের উপরে তুরস্কের জয়লাভ; এবং সমগ্র এশিয়াব্যাপী নূতন জাগরণের অদম্য উদ্দীপনা। Knowledge is power—কথাটা ত মিথ্যা নহে; যে knowledge বা বিদ্যা এক সময়ে এশিয়ার ছিল এবং তাহার প্রভুত্বের ও সভ্যতার মূলীভূত কারণ ছিল, সেই বিদ্যা ইউরোপ তাহার নিকট হইতে আহরণ করিয়া এবং আরও উৎকর্ষ বিধান করিয়া পৃথিবীতে প্রধান হইয়াছিল; সেই উন্নততর বিদ্যা আজ প্রাচীন এশিয়া পুনরায় অর্জ্জন করিয়া আবার নবীন শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? তাই বলিতেছিলাম দুই শত বৎসরের আকস্মিক সাফল্যে শ্বেতাঙ্গদিগের জাতিগত শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে না; এবং এই সাফল্যও চিরন্তন নহে।

স্থিরভাবে ধীরভাবে ইতিহাসের মোটা মোটা কথাগুলি একটু আলোচনা করিলেই আমার এই সত্যে উপনীত হইতে পারি ইহা ঠিক বটে। কিন্তু শব্দশক্তি বড় দুর্জ্জয়, পুনরুক্তির মাহাত্ম্য বড় দুরপনেয়। আমাদের যে বদ্ধমূল সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ইউরোপীয়েরা বড় ভয়ানক জাতি, দৈত্যদানব বলিলেই হয়, তাহাদের সহিত আমরা নেহাৎ নিরীহ প্রাচ্য মানব, আর কিছুতে না হউক, বাহুবলে নিশ্চয়ই

জিতিতে পারিব না, এই ধারণা সহসা দূর হয় না। তাই আমরা আর এক দিক্ দিয়া আমাদিগের আত্মাভিমান পুষ্ট করিতে চেষ্টা করি, এবং ইউরোপীয়েরাও সেই চেষ্টাতে খুব সায় দেয়।

সেই পাল্টা theory-টি এই, না হইলাম আমরা বীরের জাতি, আসুরিক শক্তি আমাদের না-ই বা থাকিল, কিন্তু আমাদের সাত্ত্বিক শক্তি মারে কে? আমরা যে আধ্যাত্মিক জাতি। আমরা ইহকালের মত ক্ষণস্থায়ী সামান্য ব্যাপারের জন্য মাথা ঘামানোর কোন আবশ্যকতাই দেখি না; দিল্লীর বাদশাহ হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরাজ যেই থাকুক না কেন, তাহাতে আমাদের কি আসে যায়? পরকাল ত আমরা reserve করিয়া বসিয়া আছি। প্রাচীন হিন্দুগণ আধুনিক এই সব রাজনীতি শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি গ্রাহ্যও করিতেন না, তাই ইতিহাস লিখিবার মত ঝকমারী তাঁহারা করেন নাই, এবং তাঁহাদের মূলনীতি ছিল "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং"। একদিকে অম্বরচুম্বী হিমালয় আর একদিকে নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল—এই অত্যন্ত নিরিবিলি যায়গায় বসিয়া প্রাচীন হিন্দুজাতি শুধু জপ তপ আর যোগ আরাধনা করিতেন, বেদ উপনিষদ্ গীতার চর্চ্চা করিতেন, অনিগ্রহত্রাসবিনীতসত্ত্ব তপোবনে অহিংসার সাধনা করিতেন, আর দিবারাত্রি কৈবল্যমুক্তির সন্ধানে ফিরিতেন, ইহাই হইল ভারতীয় সাধনা। "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—ইহাই হইল ভারতের মূলমন্ত্র।

সুতরাং ভারতের সাধনার ধরণই যখন এই প্রকার, তখন ভারতের রকম সকম সবই জগতের অন্যান্য জাতি হইতে আলাদা হইতে বাধ্য; ভারতই হইল কর্ম্মভূমি, অন্য সব দেশ ভোগভূমি; ভারতই হইল আধ্যাত্মিক, অন্য সব দেশ ঘোর জড়বাদী; ভারতই সাত্ত্বিক, অন্য সব দেশ রাজসিক কিংবা তামসিক। কাজেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি যদি বা আবশ্যক হয় তবে তাহার বিধান একটা

আধ্যাত্মিক রকমই হইবে। অন্য সব দেশে লড়াই করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে ; কিন্তু ভারতবর্ষে লড়াই ? সর্ব্বনাশ ! ভারতবর্ষের ধাতে ত লড়াই নাই, তাহার আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে যে অহিংসা ; ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ত নররক্তপাতে কদাপি কলঙ্কিত হয় নাই ; অতএব চালাও non-violent non-co-operation, চালাও চরকা—তাহাতে ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় আমাদের জাতীয় জীবনের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বর্ম্ম প্রস্তুত হইবে। সেই সূক্ষ্ম বর্ম্মে ঠেকিয়া পাশ্চাত্য জাতির কামান বন্দুক বোমা এয়ারোপ্লেন খান্ খান্ হইয়া যাইবে। আমাদের রকমই যে আলাদা।

ইহাও এক চমৎকার রকমের পাল্টা theory। ইহাতে পাশ্চাত্য শাসকজাতি সন্তুষ্ট ; তাহারা ত ইহাই চায় এবং ইহাই বলে, তোমরা এই সব শাসন শোষণ অস্ত্রধারণের ঝঞ্ঝাট বহিতে পারিবে না, উহা তোমাদের ধাতে নাই, ওসব ঝক্কি আমরা লইতেছি, তোমরা সাধন ভজন করিয়া পরকালের পথ প্রশস্ত কর। এদিকে ভয়ানক স্বদেশী সনাতনপন্থী যাঁহারা—বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত যাঁহাদের ধমনীতে খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে—তাঁহারাও খুব সন্তুষ্ট ; কারণ মানুষ কখনও সব বিষয়ে দীন প্রতিপন্ন হইতে চাহে না। বাহুবলে কিংবা ধনসম্পদে যেহেতু আজ আমরা হীন, অতএব আমরা যে চিন্তাজগতে কিংবা ধর্ম্মজগতে পাশ্চাত্য জাতি হইতে উচ্চে, ইহা যদি জোর গলায় প্রচার করিতে পারি, তবুও আত্মসম্মান কতকটা বজায় থাকে। সুতরাং একদিকে ইউরোপীয়দিগের "mild Hindoo", ও অপর দিকে উগ্র-সনাতন-পন্থীদিগের "আধ্যাত্মিক আর্য্যজাতি", এই উভয় অভিধার দৌলতে যে মন্ত্রশক্তি প্রতিনিয়ত জাতীয় মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহাতে মন অভিভূত হইয়া না পড়া সত্য সত্যই কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সত্য এই theory-রও পরিপন্থী। প্রাচীন হিন্দুজাতি ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ অনুষ্ঠান

লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিত, তাহারা রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পবাণিজ্যের ধারও ধারিত না, এবং এই সব বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতও না; কিংবা, দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনেই হউক কি রাষ্ট্রীয় জীবনেই হউক, অহিংসাই তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিত, একথা আর যাহাতেই পাওয়া যাউক, ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

প্রথমতঃ অহিংসা বা non-violence-এর কথাই ধরা যাউক। বেশ একটি ধারণা কি রকম করিয়া যেন জন্মিয়া গিয়াছে যে পাশ্চাত্যেরাই বেশী materialistic, বেশী যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রিয়; আমরা materialism বুঝিও না, রাজ্য-লোলুপতা ত আমাদের ভিতরে ছিলই না, এবং যুদ্ধবিগ্রহ আমাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এই রকম উদ্ভট অলীক মতবাদ কি প্রকারে যে প্রচারিত হইল হঠাৎ ঠাহর করা যায় না।

কারণ, হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার মূলভিত্তি যে বেদ-সংহিতা, তাহাতে অহিংসার নামগন্ধও নাই। হে ইন্দ্র আমাকে বল দেও, আমাকে ধন দেও, প্রজা দেও, আমি যেন দস্যুদিগকে নিপাত করিতে পারি—এই প্রকার অত্যন্ত materialistic এবং হিংসামূলক প্রার্থনা বেদের ছত্রে ছত্রে। তারপরে হিন্দুদর্শনের মুকুটমণি গীতা। গীতায় আর যে কর্ম্মপদ্ধতিই নির্দ্দিষ্ট হউক, অহিংসা যে উপদিষ্ট হয় নাই তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। আর রাজ্যলোলুপতা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে ছিল না ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা স্বচ্যগ্রভূমি লইয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্বের প্রচণ্ড সংগ্রামের ইতিহাস যে মহাভারত, সেই মহাভারত পড়েন নাই; আর চাণক্যনীতির কথাও কোন দিন শুনেন নাই। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-মূলক নীতি, অরি-মিত্র-অরিমিত্র-মিত্রমিত্র-পার্ষ্ণিগ্রাহ প্রভৃতির সমবায়ে রাষ্ট্রমণ্ডলের ব্যবস্থা, অতি কুটিল অর্থশাস্ত্র ও ভারতীয় রাজনীতি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে cynicism এবং দুর্নীতিমূলক রাষ্ট্রনীতিতে ভারতবর্ষ Machiavelli-কে হার মানাইয়া দিয়াছে।

আর শুধু রাজনৈতিক theory হিসাবে নহে, সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস অতি নিষ্ঠুর যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অতি ক্রূর নৃশংস অত্যাচারের ইতিহাস। পরের লেখা ইতিহাস পড়িতে বলি না; নিজেদের লেখা কহ্লনের কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত "রাজতরঙ্গিণী"-খানা উল্টাইয়া দেখিলেই একথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। একথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নয় যে ভারতবর্ষেই এই প্রকার রক্তারক্তি ও নৃশংসতা ঘটিয়াছে, অন্যত্র ঘটে নাই। সর্ব্বত্রই, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই এই রকম বীভৎসতা মানব-ইতিহাসে প্রকাশ পাইয়াছে; মানবসমাজে হয়ত অবস্থা বিশেষে এই প্রকার হিংস্র বিকটতা আবশ্যম্ভাবী। আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে আর যাহাতেই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব থাকুক, অহিংসাতে নহে। ভারতীয় জাতির মনোবৃত্তি মানব-সাধারণেরই মনোবৃত্তির ন্যায় নির্ম্মিত, কোন অভূতপূর্ব্ব অহিংস্র কোমল চিক্কণ উপাদানে গঠিত নহে।

তারপর materialism-এর কথা। একথা মোটেই সত্য নহে যে জড়জগতে উন্নতি বিষয়ে, শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে ভারতবর্ষ কিংবা প্রাচ্যদেশ উদাসীন ছিল। বরং ঐতিহাসিক সত্য তদ্বিপরীত। যতই প্রাচীন তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে জড়জগতের সমস্ত বিভাগে, বিজ্ঞানের সমুদয় শাখা প্রশাখায় প্রাচীন হিন্দুজাতি গবেষণা করিয়াছে, আবিষ্কার করিয়াছে, নব নব সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, শব্দতত্ত্ব, ব্যাকরণ, কোন দিকেই তাহাদের মনোযোগ এড়ায় নাই! শিল্প-বাণিজ্যের কথা ত বলাই বাহুল্য—ভারতীয় শিল্পের খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীময় বিখ্যাত, এবং ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রাচীন কালে মিশর ফিনিশিয়া রোম চীন জাপান পর্য্যন্ত রপ্তানী হইত। বাণিজ্য-প্রসারের এতদপেক্ষা বিশিষ্ট নিদর্শন কি হইতে পারে? তারপর কলাশিল্প বা art-এর দিক্। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, কাব্য, নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীত, নৃত্যকলা,

এমন কি কামশাস্ত্র পর্য্যন্ত, বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধভাবে প্রাচীন হিন্দুগণ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অন্য কোন্ প্রাচীন সমাজ এই প্রকার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে জানিনা।

তাছাড়া, ভারতবর্ষ যে বাহিরের সমস্ত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক অদ্ভুত isolated সভ্যতার সাধনা করিয়াছিল তাহাও নহে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে মোটেই বিচ্ছিন্ন কিংবা isolated ছিল না। ভারতীয় পরিব্রাজকগণ ও বণিক্‌গণ সমস্ত এশিয়াখণ্ডে বিচরণ করিত। একদিকে মিশর, গ্রীস, পারস্য, একদিকে গান্ধার, মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, জাপান, আর একদিকে ব্রহ্ম, শ্যাম, চম্পা, মলয়-উপদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ—সর্ব্বত্রই ভারতীয় পণ্যদ্রব্য, ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় সভ্যতার ধারা ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়াছিল। এবং এই intercourse একদিন দুইদিনের নহে, অন্ততঃ বৌদ্ধযুগ হইতে মুসলমানযুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই intercourse প্রচলিত ছিল। মুসলমানযুগে ত ছিলই, কারণ মোগল পাঠান তুর্কদিগের মাতৃভূমিই ত মধ্য-এশিয়ার সন্নিহিত ভূখণ্ডে।

ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব থাকিতে পারে—কোন্ সভ্যতারই বা কোন না কোন বিষয়ে বিশেষত্ব নাই? কিন্তু তা বলিয়া কোন কালেই তাহা পৃথিবীবর্জ্জিত সৃষ্টিছাড়া একটা কিছু ছিলনা। যেমন একদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধসভ্যতা সমস্ত এশিয়াকে এবং তৎসঙ্গে সমস্ত জগৎকে অনেক বিষয়ে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তেমনই অপরদিকে বাহিরের সভ্যতাও ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ ও democratic ভাবধারা হিন্দু সাধনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানকের ধর্ম্মান্দোলনকে জন্মদান করিয়াছে; আবার পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে গত এক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্যের নবলব্ধ political liberty, free thinking ও in-

dividualism, নব্যভারতকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের মানসিক গঠনসংস্থান মূলতঃ এতই এক প্রকার যে পরস্পরের সামান্য যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অতি সহজেই এক হইতে অপরে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। সমস্ত মানবসমাজের ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। Chosen Race-এর কল্পনার মত আত্মপ্রবঞ্চনা ও অভিমান আর কিছু হইতে পারে না।

তারপর, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা। আমরা আজকার বিজ্ঞানদৃপ্ত শক্তিশালী মদমত্ত ইউরোপ দেখিয়া তাহাকে জড়বাদী বলিয়া চীৎকার করি। কেন, মধ্যযুগের পোপ-শাসিত, মঠ ও সন্ন্যাসাশ্রম পরিপূর্ণ ইউরোপ কি ইউরোপ নহে? মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধর্ম্মোন্মাদ, তাহার পরকালপ্রিয়তা, তাহার Franciscan, Dominican, প্রভৃতি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়, তাহার Society of Jesus, তাহার Crusades, তাহার St. Francis of Assisi, Thomas a Kempis, Catherine of Siena, তাহার প্রবলতম সম্রাট্ Charles V-এর শেষ বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন, এসব কি কিছুই নহে? পাশ্চাত্য সমাজের ইতিহাসেও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ কিছু কম দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃ এবিষয়েও মানুষে মানুষে ভয়ানক অলঙ্ঘনীয় কোন প্রভেদ নাই; ধর্ম্মানুষ্ঠানের আত্যন্তিকতা, পুরোহিত-রাজ, ব্রাহ্মণের আধিপত্য, পরকালমত্ততা—ইহাও মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির একটা stage বা স্তর মাত্র। আজ যে সারা প্রাচ্যদেশ জুড়িয়া আধুনিকতার ঢেউ উঠিয়াছে—মোটে এই অল্প কিছুকাল আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের সংস্পর্শে আসিয়া—ইহাতে আমাদের এত সাধের কল্পিত আধ্যাত্মিকতা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আর যদি শেষাশেষি প্রাচ্যের এই বিশিষ্ট আধ্যাত্মিকতা উবিয়াই যায়, তাহা হইলে এত মুহুর্মুহুঃ প্রচারিত genius of the race রহিল কোথায়?

পুনরুক্তির প্রবল প্রভাব সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা গেল। বস্তুতঃ, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব যে সাক্ষ্যই দিউক না কেন, পুনরুক্তির সম্মোহিনী শক্তি এখনও যথেষ্ট প্রবল রহিয়াছে, ইহা যে অবসন্নতা যে আড়ষ্টতা যে আচ্ছন্নতা আনিয়া দিয়াছে তাহার ঘোর এখনও কাটে নাই। হিন্দুশাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম; কথাটা ত একবারে মিথ্যা নয়। এই দুর্ব্বার শব্দশক্তিকে আয়ত্ত পরাভূত করিতে হইলে একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র সত্যানুসন্ধান। এই পুনরুক্তির তমোময় আবেশ দূরীভূত করিয়া ব্যক্তিকে কিংবা জাতিকে পুনরায় আত্মস্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একমাত্র উপায়, সত্যের আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ করা, কারণ আলোকের সমক্ষে তমিস্রার পলায়ন অনিবার্য্য। ভয় করিবার কোন কারণ নাই। পুনরুক্তির প্রতাপ যতই প্রবল হউক, মন্ত্রের শক্তি যতই দুর্জ্জয় হউক, সত্যের জয় হইবেই—সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

আশ্বিন, ১৩৩৩।

———:*:———

ব্যাঘ্রধর্ম

ব্যাঘ্রধর্ম্ম

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে স্বরাজ স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা আন্দোলন প্রভৃতি হইতে থাকায় আমাদের ইংলণ্ডীয় ভাগ্যবিধাতৃগণ এই সম্বন্ধে একটা মতামত না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদারভাবে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ জানাইয়াছেন, তবে কিনা এইটুকু পুনশ্চ দিয়াছেন যে এসমস্ত বিষয় তাড়াতাড়ি অথবা রাতারাতি সম্পন্ন হইবার নয়। আর অপর একদল, যাঁহারা কথার অত মারপ্যাঁচ বোঝেন না, অথবা বুঝিলেও ঠিক ব্রাকেটের মধ্যে পদাঘাত করাটা পছন্দ করেন না, পরন্তু তদপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে পদাঘাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাঁহারা খোলাখুলিই বলিয়াছেন যে আমাদের এই সমস্ত দাবী দাওয়া বাতুলের প্রলাপ মাত্র; শুধু তাহাই নয়, একান্ত অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক; কারণ ভারতবর্ষ তাঁহারা অসিবলে জয় করিয়াছেন এবং অসিবলেই তাহা

রাখিবার সঙ্কল্প রাখেন; এবং অধিকন্তু তাঁহারা শাসাইয়াছেন যে এসম্বন্ধে যাহারা কোন কথা বলিতে বা প্রতিবাদ করিতে আসিবে তাহাদিগকে ব্রিটিশ-সিংহের tiger-qualities অথবা ব্যাঘ্রধর্ম্ম প্রদর্শনদ্বারা সায়েস্তা রাখিতে হইবে। (কথাটা একটু জীববিজ্ঞানের বিরোধী হইল, পাঠক মাপ করিবেন।)

আমরা অবশ্য এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে অত্যন্তই বিরক্ত হইয়া থাকি; অপমান যে হইল সে জন্য অবশ্য ততটা নয়, কারণ তাহা উভয়ত্রই প্রায় সমান; তবে অপমান করিতে হইলেও তাহা ভদ্রভাবে করাই বাঞ্ছনীয়, স্পষ্টতঃ দাঁতখিচুনীটা পরম অভব্য কিনা তাই। এবং মহানুভব উদারহৃদয় মার্জ্জিতরুচি ইংরাজ ভারতবন্ধুগণও একবাক্যে এরূপ অভদ্রতার তীব্র প্রতি-বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিতে গেলে কি মনে হয় না যে শেষের জবাবটি কিছু কড়া রকমের হইলেও সেইটির ভিতরই সারবত্তা বেশী? "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এই ভদ্রজনোচিত উপদেশের উহা বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু হিতকারিত্ব ও মনোহারিত্ব এই দুইটি গুণের শেষোক্তটির কিছু অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রথমোক্তটির অভাব যে উহাতে নাই সে সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মতভেদ হইবে না। তাই এই হিতকর ব্যাঘ্রধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সত্য কথা বলিতে গেলে, শুধু ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতাধিকার নয়, প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই অর্ব্বাচীন বিংশশতাব্দীর মহাসমর পর্য্যন্ত, সকল দেশের ইতিহাসেই কি আমরা দেখিতে পাই না যে tiger-qualities বা ব্যাঘ্রধর্ম্মের সদ্ভাব-অসদ্ভাবের উপরই জয়-পরাজয় নির্ভর করিয়াছে? একথায় সায় দিতে অবশ্য আমাদের সহসা প্রবৃত্তি হয় না। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে, "The wish is father to the thought"। সেই প্রবচনানুযায়ী আমাদের ইহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে যখনই কোন সভ্যতা অপর কোন সভ্যতাকে, কোন জাতি অপর

কোন জাতিকে জয় করিয়াছে বা গ্রাস করিয়াছে বা হয়ত তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত সভ্যতার উৎকর্ষই সেই জয় অথবা সেই সফলতার কারণ।

আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন দৃষ্টান্ত এই মতকে সমর্থনও করে। প্রথমেই আমরা হয়ত বলিব যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যে আদিম অধিবাসিগণ ছিল এবং যাহাদিগের বংশধরগণ আজকাল zoological specimen হিসাবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনধারণ করিতেছে, তাহারা উচ্চতর উন্নততর সভ্যতাবিশিষ্ট শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক-গণের সংঘর্ষে আসিয়া উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে; কারণ উচ্চতর সভ্যতার সঙ্গে নিম্নতর সভ্যতার সঙ্ঘাত ঘটিলেই কথামালা-বর্ণিত কাংস্যপাত্র ও মৃন্ময়পাত্রবিষয়ক গল্প অনুসারে শেষোক্তটির বিনাশ অনিবার্য্য। অষ্ট্রেলিয়ার Bushmen-দিগের সম্বন্ধেও বোধ হয় এই একই কথা বলা হইবে।

এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সাধারণতঃ যে অর্থে আমরা সভ্যতাকে উচ্চ বা নীচ আখ্যায় অভিহিত করি, তাহা কোন্ লক্ষণ বিচার করিয়া? যে জাতি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মনিষ্ঠতায়, সামাজিক আচার-ব্যবহারে আদর-আপ্যায়নে, এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের কমনীয়তায় ও মাধুর্য্যে, অপর কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহাকেই আমরা সভ্যতর বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এভাবটা আমাদের মনে এতই দৃঢ়বদ্ধ যে সভ্য বলিলে আমরা ভব্যই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং যে সভ্যতা যে পরিমাণে নম্রতা, বিনয়, ভব্যতা, ধর্ম্মশীলতার পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করে, সে সভ্যতা সেই পরিমাণে উচ্চ। এই ধারণা ঠিক কিনা সে তর্ক এখনই করিতে চাই না, কিন্তু ইহাই মোটামুটিভাবে আমাদের সাধারণ ধারণা।

তাহাই যদি হয় তবে এই প্রশ্ন তুলিতে আমরা বাধ্য যে যে সব গুণকে আমরা বিশেষভাবে সভ্যতার লক্ষণ মনে করিয়া থাকি সেই সব গুণের

প্রাচুর্য্য হেতুই কি অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসিগণের ধ্বংস সাধন করিয়াছে? আমেরিকাগামী Pizarro অথবা Cortes-এর অনুবর্ত্তী স্পানিয়ার্ডগণের অথবা Botany Bay-তে নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগের ধর্ম্মনীতি ও সভ্যতা কি এতই উচুদরের ছিল যে তাহার দরুণ দুই এক শতাব্দীর ভিতরেই সেই সেই দেশের আদিম অধিবাসিগণ একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল? এত বড় অসম্ভব কথা বোধ করি কেহ বলিবেন না। কোন কোন গুণে তাহারা যে শ্রেষ্ঠতর বা দুর্দ্ধর্ষতর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি আমরা যাহাকে সভ্যতা আখ্যা দিই তাহা নহে, সেগুলি সেই tiger-qualities।

এগুলি ত গেল প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্ত। সপক্ষে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য আর বেশী হাতড়াইতে বোধ হয় হইবে না, কারণ,

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সে দিকেই তাই দেখি।

স্যাক্‌সন ও দিনেমার জলদস্যুদিগের হস্তে প্রাচীন ব্রিটনের দুর্দ্দশা, সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর হস্তে হিন্দু-ভারতের লাঞ্ছনা, অষ্ট্রগথ ভিসিগথ সুয়েভ আলেমান প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিদিগের প্রকোপে বিশাল রোমক-সাম্রাজ্যের ধ্বংস, এই সমস্ত ঘটনা স্পষ্টতঃ দেখাইয়া দিতেছে যে ব্যাঘ্রধর্ম্মই সেরা ধর্ম্ম, অন্ততঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে ও উদাহরণে, বিশেষতঃ এই সিদ্ধান্তে, আমাদের মানবোচিত আত্মাভিমানে কিছু আঘাত লাগে, তাহা স্বীকার করি। আমরা মানুষ ও অ-মানুষ জন্তুদিগের মধ্যে এমন একটা সুদূর পার্থক্য ও অভিমানের প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছি যে কোন বিষয়েই জন্তুর সামিল হওয়াই যেন মস্ত একটা লজ্জার কথা। "পশু" অথবা "জন্তু" বলিয়া কাহাকেও অভিহিত করিলে মানহানির মোকদ্দমা আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু পশুত্বকে বর্জ্জনীয়ের কোটায় ফেলিয়া আর বোধ হয়

চলিতেছে না। মানবসুলভ গর্ব্ব ও মত্ততা ছাড়িয়া স্থির ধীরভাবে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের চক্ষে দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? জগতে জীবনসংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে জীবের অভাব পূরণ করিতে হইবে, প্রয়োজনানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে, দয়া বা নীতি বা ধর্ম্মের কোন বালাই থাকিলে চলিবে না, বাধাবন্ধহীন দ্বিধালেশহীন শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, অধিক বিচার-বিতর্ক-সংশয় দূর করিতে হইবে। এই attitude-কেই মোটামুটি ব্যাঘ্রধর্ম্মের সংজ্ঞাভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি; এবং ইহারই উপর জান্তব survival বা জীবনযুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

শুধু তাহাই নহে। যদিও মানুষ নিজেকে বড় মনে করে এবং নিজেকে পশুভাবাপন্ন মনে করিতে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করে, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যেখানেই মানুষ এই ব্যাঘ্রধর্ম্মের বা শার্দ্দূল-প্রকৃতির সমধিক বিকাশ দেখিতে পায় সেই খানেই সে সভয় ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে। যখনই মানুষ দেখে যে কোন ব্যক্তি সহস্র বাধাবিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়া সহস্র বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিরুদ্ধশক্তিকে পদদলিত করিয়া আপন সংকল্প সিদ্ধ করিয়াছে, আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, তখনই তাহাকে বীর বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া তাহার পদতলে প্রণত হইয়া পড়ে। তাহার কার্য্যাবলী ধর্ম্মানুমোদিত না হইতে পারে, নীতিপুস্তকের চতুঃসীমার মধ্যেও তাহা না পড়িতে পারে, কিন্তু যদি বীর্য্য ধৈর্য্য সাহস দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি গুণে সে জগতের ইতিহাসে সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে Great পদবাচ্য হইয়া থাকে।

যাহা কিছু বৃহৎ, যাহা কিছু প্রবল, যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, তাহাই যেন মানবের অন্তর্নিহিত যে পাশবতা যে নগ্ন শক্তিপ্রিয়তা রহিয়াছে, তাহাতে ইন্ধন প্রয়োগ করে। সেইজন্যই মানবের ভাষাতেও নরশ্রেষ্ঠের

অপর নাম নরশার্দ্দূল। এই আখ্যাতেই মানুষের অন্তঃস্থিত আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা কোন্ দিকে তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। এবং আমরা সচরাচর যাহাকে পুরুষত্ব বা পৌরুষ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাহাও বোধ করি এই tiger-qualities-এরই সমাবেশের কাছাকাছি একটা কিছু জিনিষ হইবে। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা হইলেও, ব্যাঘ্রধর্ম্মই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, অন্ততঃ সাধারণতঃ আমরা যাহাকে মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি। জানিনা বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় আপত্তি করিবেন কিনা ; কারণ তিনি বলিতে পারেন যে ক্ষীণজীবী মনুজের সহিত মহাপ্রাণ বৃহল্লাঙ্গূল সম্প্রদায়কে একধর্ম্মাক্রান্ত করা অত্যন্ত ধৃষ্টতার কার্য্য ; তবে অবশ্য যখন আমরা মহাপ্রাণ সম্প্রদায়কে আমাদের ক্ষীণজীবী সমাজের আদর্শরূপে ধরিয়াছি, তখন তিনি আমাদের মার্জ্জনা করিলেও করিতে পারেন।

রহস্য ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে ভাবিতে গেলেও কথাটা কতক পরিমাণে হেঁয়ালীর মত শুনায়। কোথায় মানুষকে প্রাণিজগতের অত্যুচ্চে স্থান দিব, না একেবারে মানুষের আদর্শ, মানবের পুরুষত্বের আধার হইল, tiger-qualities ? কিন্তু একথায় এতটা চমকিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। মানুষের যে শক্তিমত্তা, শক্তিপ্রিয়তা, শক্তি-সাধনাকে আমরা মোটামুটিভাবে ব্যাঘ্রধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, বাস্তবিকই কি তাহা মানব-চরিত্রের সর্ব্ববিধ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার ভিত্তি নহে ? জীবনের কিংবা চরিত্রের কোমলতা নমনীয়তা মাধুর্য্যই বড় জিনিষ নহে, তদপেক্ষা পাকা জিনিষ হইতেছে সাহস কাঠিন্য ও স্বাধীনতা।

এক কথায় বীরত্বই মনুষ্যত্বের ভিত্তি। বীরত্বের মধ্যে অনেক সময়ে নৃশংসতা নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতা আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু একথাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে এই বীরত্ব হইতেই এজগতের সকল বড় আন্দোলন, সকল বড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সকল বড় মহৎ কার্য্যের উৎপত্তি। মানুষের

মজ্জাগত এই যে শক্তি অথবা energy, ইহা যখন ধ্বংসের কার্য্যে প্রযুক্ত হয় তখন বিভীষিকা উৎপাদন করে বটে, কিন্তু এই শক্তিই যখন জগতের মঙ্গলের জন্য, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য, মনুষ্যের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হয়, তখন তাহারও অভাবনীয় ফলোপধায়কতা দেখিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত হইতে হয়।

সকল সময়ে এই শক্তির প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকা যায় না, তথাপি সেই নিরর্থক শক্তির অপব্যয়ও আমাদিগের মনের উপর একটা ভয়ঙ্কর আকর্ষণ বিস্তার করিয়া থাকে। ইউরোপের ইতিহাসে আমরা এই যে একটা জিনিষের পরিচয় পাই, এই যে একটা উদ্দাম শক্তিলিপ্সার ও শক্তিক্ষয়ের দৃষ্টান্ত দেখি, যতই কেননা নিরীহ সত্বগুণোপেত আমরা তাহাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিবার প্রয়াস করি, তথাপি আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না। পেরু কিংবা ক্যালিফর্ণিয়ার El Dorado-র বা সুবর্ণখনির লোভে মানুষ কি প্রকারে সকল রকম কষ্ট সহ্য করিয়াও দলে দলে মরুপথে ছুটিতে পারে তাহা বরং কতকটা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু মধ্য-আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের ভিতরে, অথবা উত্তরমেরু কিংবা দক্ষিণ মেরুর চির-তুষারাবৃত মরুতটে, অথবা দুর্জ্জয় হিমগিরির উচ্চতম শিখরদেশে, শুদ্ধমাত্র ভৌগোলিক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে মানুষ কি করিয়া জীবন পণ করিতে পারে তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সুচারুভাবে বিমানচালনের কৌশল আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত কত শত লোক যে প্রাণ দান করিল, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু প্রতীচ্যের এই উদ্যমের এই উৎসাহের এই প্রচেষ্টার যেন আর বিরাম নাই। বিজ্ঞানে সাহিত্যে কলায় কৌশলে বাণিজ্যে, এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই, এই শক্তি এই উদ্যম নব নব পন্থার আবিষ্কার সাধন করিতেছে।

আমরা অবশ্য এই প্রতীচ্য শক্তি-উপাসনাকে Romano-Gothic বর্ব্বরতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলিয়াই মনে করি; এবং ইহা ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই যে তবু যাহা হউক সুসভ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই বর্ব্বরতার রাশ কতকটা টানিয়া ধরিয়াছে, নতুবা পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির বাস করা অসম্ভব হইত। আমাদের মনে হয় যে শান্তরসাস্পদ মৈত্রীমূলক খৃষ্টধর্ম্মের শীতল প্রলেপে ইউরোপীয় বর্ব্বরতার প্রকুপিত বায়ুকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত রাখিয়াছে।

কিন্তু তথাপি এই দুইটি জিনিষ, এই বর্ব্বরতা ও এই বীরত্ব, এই নৃশংসতা ও এই নিঃশঙ্কতা, একই কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। যে বেলজিয়ম কঙ্গোতে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, এবং যে বেলজিয়ম স্বদেশে নির্ভীকভাবে অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছে, তাহা একই বেলজিয়ম বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টধর্ম্ম জগতের প্রভূত উপকার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই Romano-Gothic বংশের আদিম মৌলিক বর্ব্বরতা না থাকিলে বর্ত্তমান জগৎ বিংশ শতাব্দীর জগৎ হইয়া উঠিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনিগ্রহত্রাসবিনীতসত্ত্ব ভারতীয় তপোবনের প্রাচীন সাধনার উত্তরাধিকারী আমাদিগের হয়ত মনে হইতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর জগতে এমন কোন মাধুর্য্য নাই যাহা না হইলে আমাদের চলিত না; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জগৎ ত আমাদের সেই অভিমানের জন্য নিজেকে কিছুমাত্র দূরে রাখিয়া চলিতেছে না, বরঞ্চ আমাদের সমস্ত বাধা নিষেধ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হুড়মুড় করিয়া আসিয়া আমাদের কাঁধের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

সুতরাং এখন প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে খৃষ্টধর্ম্ম অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মে আমাদিগের কাজ চলিবে কিনা। যতদূর দেখা যায় তাহাতে ত মনে হয় যে "একগালে চড় দিলে অন্য গাল পাতিয়াদিতে হইবে", এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে কাল হইতে কালান্তরে এবং দেশ হইতে দেশান্তরে দুই গালেই কেবল মুহুর্মুহুঃ চড়ই খাইতে হইবে।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন"

হরি সদা কীর্ত্তনীয় কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের অবস্থা যে বিশেষ লোভনীয় হইয়া উঠিবে না ইহাতে কোন সংশয় নাই, পরন্তু ইহাই স্থির নিশ্চিত বলিয়া বোধ হয় যে তৃণের ন্যায় সুনীচ হইয়াই তাহার চিরকাল কাটাইতে হইবে, এবং এই অবস্থা হইতে উচ্চে উঠিবার দুরভিসন্ধি তাহার পক্ষে দুঃসাহস বলিয়াই পরিগণিত হইবে। এই প্রেমের ধর্ম্ম, ত্যাগের ধর্ম্ম, দীনতার ধর্ম্মকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় বিবেচনা করিয়াই বোধ করি, যে দেশে এক শতাব্দী পূর্ব্বে, "Entbehren sollst du, sollst entbehren"—ত্যাগ কর, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—গেটের এই মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল, আজ সেই জার্ম্মান দেশ Uebermensch বা অতিমানুষের আদর্শে আচ্ছন্ন হইয়া weltmacht বা বিশ্ব-শক্তির জন্য তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ের বিষয় এই যে যে দেশে বাইবেলের ধর্ম্ম প্রচারিত হইল সেই দেশ হইল শক্তিলিপ্সু, আর যে দেশে গীতাধর্ম্মের প্রচার সেই দেশ হইল শান্তিপ্রিয়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

বাস্তবিক ভাবিবার কথা এই, দীনতার ধর্ম্ম, অনুশোচনার ধর্ম্ম, আত্মগ্লানির ধর্ম্ম মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগরিত করে, না স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়ের ধর্ম্ম মানবজীবনকে পূর্ণ পরিণতি প্রদান করে? স্বভাবতঃ মানুষ নিজের উপর প্রত্যয়শীল এবং নির্ভরশীল, এবং সেই নির্ভরের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া দেওয়াই ত সহজ ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। তাহা না করিয়া, শুধু নিয়ত নিজের দোষ ত্রুটীর আলোচনা করিলে, আত্মবোধের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকিলে মনের কি একরকম অস্বাভাবিক অবস্থা হয় যাহা সুস্থ সবল জীবন যাপনের পক্ষে মোটেই

অনুকূল নহে। আলাপে ব্যবহারে কথায় এবং চিন্তাতেও সব সময়ে নিজেকে দীনহীন এবং খাটো বলিয়া জ্ঞান করিতে করিতে বাস্তবিকই মানুষের চরিত্র যেন নিস্তেজ ও খাটো হইয়া আসে। সুতরাং মানুষের শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে এই পথ প্রকৃত পথ নহে। নেতা কিংবা চালক কখনও এপদার্থে নির্ম্মিত হইতে পারে না। সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ অনুচর প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইলে বোধ হয় ততটা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তৃণাদপি সুনীচেন একজন নেতাদ্বারা যে কিরূপে বিজয় লাভ করা যায়, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। নেতার ধর্ম্মকে আমরা যদি ব্যাঘ্রধর্ম্ম নামে আখ্যাত করি, নীতের ধর্ম্মকে আমরা তদনুসারে মেষধর্ম্ম আখ্যা দিতে পারি। নৈয়ায়িকের গড্ডালিকাপ্রবাহ ন্যায়েরও ভরসা করি ইহাতে কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

কবি গাহিয়া গিয়াছেন, "মানুষ আমরা, নহি ত মেষ"; কেহ কেহ আবার কমাটিকে একটু খানি সরাইয়া দিয়া বলিতে চাহেন, "মানুষ আমরা নহি ত, মেষ।" এই দ্বিবিধ পদবিন্যাসের কোন্‌টি যে যথার্থ তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদের সম্ভাবনা। আমার ত মনে হয় শেষের বিন্যাসটিই মোটা-মুটি সত্য, প্রথমটি কেবল আদর্শ মাত্র। শুধু যে মনের দুঃখে আমাদের দেশ সম্বন্ধেই এবংবিধ করুণ কথা বলিতেছি তাহা নহে, বস্তুতঃ সকল দেশেই মানুষ জাতীয় লোকের অভাব, কিন্তু মেষজাতীয় লোকের অন্ত নাই। রবিবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তাহারাই পনের আনা। তাহারা গতানুগতিক, তাহারা নীত হয়, চালিত হয়, চালাইবার ক্ষমতা কদাচ তাহাদের হয় না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই Nietzsche ইহাদের অবলম্বিত নীতিকে slave-morality আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন।

তবে সৌভাগ্যবশতঃ একথাও সত্য যে এই মেষসুলভ নিরীহ নিঃস্পন্দ জীবনযাত্রা জীবনকে একেবারে অসাড় করিয়া ফেলে বলিয়া সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে জীবনটাকে তরঙ্গিত করিবার

অভিলাষ করে; এবং নিজের জীবনে সে শুভ মুহূর্ত্ত যদি কখনও না-ও আসে, তবে অন্ততঃ অন্য কাহারও জীবনসঙ্গীতের রুদ্রতাল অনুভব করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করে। এই প্রেরণা যাহার মধ্যে যত বেশী তাহারই জীবনের বৈচিত্র্য মনুষ্যত্বের বিকাশ সেই পরিমাণে বেশী। এই প্রেরণাই মানুষকে অনাদিকাল হইতে বিপদের দিকে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রণবাদ্যের মোহ, সংগ্রামের মত্ততা এই প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত। শত যুক্তি তর্ক বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও, সহস্র অসুবিধা ক্ষতি উৎপীড়ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও, এই জন্যই মানবহৃদয়ে সমরসাধ এত দুরপনেয়। ধীর স্থির সদ্বিবেচক জ্ঞানিগণ এইজন্য এত Hague Tribunal করিয়াও সমর নিবৃত্তি করিতে পারিতেছেন না। আর সম্পূর্ণরূপে সমরনিবৃত্তি, সম্ভবপর হইলেও, মানবসমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় কিনা সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ। কোন বিপদ্, কোন ঝঞ্ঝা, কোন মৃত্যুবিভীষিকা নাই—শুধু একঘেয়ে একটানা টাকা-আনা-পাই সংক্রান্ত ব্যবসায় কারবার দিনের পর দিন নিয়মিত ভাবে চালাইতে হইলে জীবন ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে; যেরূপ, সমস্ত ভূভাগ latitude longitude-এ একেবারে নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হইয়া লূতাতন্তুর ন্যায় রেলজালে আবৃত হইলে ব্যবসাদারের সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অকেজো পর্য্যটকের ভ্রমণানন্দ চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

আর একথাও ত বুঝিতে পারি না কেনই বা সমরে শ্রেষ্ঠতায় জাতির শ্রেষ্ঠতা নির্ণীত হইবে :না। সমস্ত প্রাণিজগতের ভিতরে যে জীবনসংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, তাহা ত শুধু সমরনিপুণতার পরীক্ষা বলিয়াই মনে হয়; আধ্যাত্মিকতার চিহ্নমাত্র ত তাহাতে দেখিতে পাই না। শুধু জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের সময়েই দয়াধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া অযথা গোল পাকাইয়া তুলিবে? ইহাও ত বড় অন্যায় আবদার। শক্তির পরীক্ষাই ত শেষ পরীক্ষা।

যখন একটা জাতি আর একটা জাতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল, তখন ইহাই ত বুঝিতে হইবে যে প্রথমোক্ত জাতি জীবনযুদ্ধোপযোগী উপকরণাদিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল; সেই জাতির বংশের ধারা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। আর Weismann-এর সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় যে অর্জ্জিত গুণ সন্তানে অর্শে না, তাহা হইলে ত এই দুর্ব্বল জাতিকে বারংবার শিক্ষাদীক্ষাদির দ্বারা সতেজ করিয়াও কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে না, কেবল লাভের মধ্যে ঐ দুর্ব্বল জাতির বংশবৃদ্ধি সমস্ত মানব জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কি মানবসমাজের উপকার সাধিত হইবে?

আচার্য্য হাক্সলি একবার Romanes Lecture-এ বলিয়াছিলেন বটে যে যুদ্ধে পারদর্শিতার সহিত উন্নত সভ্যতার কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ survival of the fittest মন্ত্রের fittest সব সময়ে best নহে। সভ্যতার সাধারণ ধারণা, যাহা আমরা প্রারম্ভেই আলোচনা করিয়াছি, তদনুসারে ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যে best survive করিবে না তাহাকে best বলিয়া আমরা অনর্থক আমাদের মনঃকষ্ট বাড়াই কেন? সেই best প্লেটোর archetype-এর স্বর্গরাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবে বসবাস করিতে পারে, কিন্তু এই মরজগতে তাহাকেই আমরা best বলিব, যাহা জীবনযুদ্ধে টিঁকিয়া থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের অপর কোন কষ্টিপাথর নাই। সমরবাদের মূল সত্য এই খানেই—Might *is* right। পশুধর্ম্ম বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিলে কোনই লাভ নাই, কারণ might-ই হইতেছে right-এর একমাত্র প্রমাণ।

তাই শক্তির উপাসনা, মানুষের শত ছলনা শত আত্মপ্রতারণা সত্ত্বেও মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী। সর্ব্বগ্রাসী শক্তির রুদ্র জ্বালা মানবমনকে অভিভূত করে, তথাকথিত ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষের অন্তরতম শক্তিপূজাকে

ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, এবং মানুষ নিজেও অপ্রতিহত শক্তিলাভ একান্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। মানব তাহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি এই ভাবেই লাভ করে। তাই যখন মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন এই কথাটাই তাহাকে শুনাইতে হইবে যে দুর্ব্বলতা তাহার জন্য নহে, সে বিশ্ব-শক্তির আধার, তাহাকে জয়ী হইতে হইবে। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে শক্তি-সাধনাই তাহার করিতে হইবে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই মন্ত্রই প্রচার করিয়া গিয়াছেন :

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

বৈশাখ, ১৩২৪।

-:*:

শিক্ষার আয়তন

শিক্ষার আয়তন

আজকাল আমাদের দেশ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা ও আন্দোলনে বেশ একটু সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। যেখানেই দুই চারিজন শিক্ষিত ভদ্রলোক সমবেত হন, সেখানেই এসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, এবং আদিম, মধ্যম ও অন্তিম, এই ত্রিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধেই বিস্তর মতামত ব্যক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসঙ্গ ত লাগিয়াই আছে। আগে ভাবিতাম বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি একটা বিরাট্ বিশ্বতোমুখ কারবার; এখন ত দেখি যে এখানে সেখানে ও সর্ব্বত্রই এক একটা "বিশ্ব-বিদ্যালয়" খাড়া হইয়া উঠিতেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে সাবেক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া শুধু মাত্র একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রচিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই সাবেক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেস্তনেস্ত করিবার জন্য খোদ বিলাত হইতে যে স্যাড্‌লার কমিশন আসিয়াছিল তাহার

তের-ভলুম-সন্নিবিষ্ট জবর রিপোর্টের জোরে বাঙ্গালায় বিশেষ কিছু ফলোদয় না হইলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেখিতে দেখিতে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় ভূরি ভূরি বিশ্ববিদ্যালয় গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার আমাদের মধ্যে কোন কোন মনীষী মাঝে মাঝে প্রস্তাব করিয়া থাকেন যে বাঙ্গালাতেও মালদহ নদীয়া প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্র-ভূমিতে বা cultural regions-এ মালদহ-সভ্যতা নদীয়া-সভ্যতা ইত্যাদির সারাকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তত্তদ্দেশে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। তাছাড়া, এই উচ্চশিক্ষার প্রকৃতিটা কিপ্রকার হইবে—cultural হইবে কি vocational হইবে, humanistic হইবে কি scientific হইবে—ইহা লইয়াও কলরবের অন্ত নাই। ৮

অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার কথা যদি ছাড়িয়াই দেই, আদিম বা প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নও লোকের মনোযোগ অল্প আকর্ষণ করিতেছে না। বোম্বাই ও কলিকাতাতে মিউনিসিপালিটির অধিকারভুক্ত স্থানগুলিতে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা অবাধে এবং বিনা খরচে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরলোকগত গোখলে সাহেব আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র ভারতে ঐভাবে প্রচারিত হইতে পারে; তিনি জীবিত থাকিতে যাহার সূচনাও দেখিয়া যাইবার সুবিধা তাঁহার হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর এত অল্পকাল পরেই যে অন্ততঃ তাহার সূত্রপাতও হইল ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে।

এখন শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি দল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একদল চাহেন শিক্ষার উচ্চতা ও গভীরতা বৃদ্ধি করিতে, এবং অপর দল চাহেন শিক্ষার প্রসার ও বিস্তার বৃদ্ধি করিতে। পূর্ব্বপক্ষ বলেন, শিক্ষার আদর্শকে কখনও খাটো হইতে দেওয়া উচিত নহে; এমন সব শিক্ষালয় তৈয়ার করিতে হইবে যেখানে উচ্চতম শিক্ষা উন্নততম প্রণালীতে দেওয়া যাইতে পারে; সেরকম বিদ্যালয় সংখ্যায় যদি বেশী না-ও হয় তাহাতে

ক্ষোভের কোন কারণ নাই; কতকগুলি মাঝারি গোছের মরিচাধরা ইস্কুল করিয়া দলে দলে ছেলেকে cheap matriculation পরীক্ষা পাস করানোতে শিক্ষার উন্নতি তো হয়ই না বরঞ্চ শিক্ষার উচ্চ আদর্শকে একেবারে খর্ব্ব করা হয়; দেশে কতকগুলি অপদার্থ ডেঁপো ছেলে তৈয়ার হয়; পালে পালে ডিগ্রী লইয়া ছেলের দল discontented B. A.-র সংখ্যা পরিপুষ্ট করে। এই সস্তা ডিগ্রীতে দেশটা গোল্লায় যাইতে চলিল। যদি দেশের উন্নতি চাও, যদি শিক্ষার ও শিক্ষিতের উজ্জ্বল আদর্শকে অপরিম্লান রাখিতে চাও, তবে অকর্ম্মণ্য স্কুল কলেজ তুলিয়া দিয়া Oxford, Cambridge-এর মত কলেজ এবং Eton, Rugby-র মত স্কুল প্রতিষ্ঠা কর। এক কথায় এই পক্ষীয় ব্যক্তিগণ "fit audience though few"-ই পছন্দ করেন।

অপর পক্ষ বলেন, গরীবের ঘোড়া রোগ কেন? দেশে অজ্ঞানান্ধকার ঘোরতরভাবে সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে; এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার সমস্ত সভ্য দেশের শিক্ষিত লোকের অনুপাত অপেক্ষা আমাদের দেশের অনুপাত কম; এরূপ অবস্থায় কোথায় আমাদের কর্ত্তব্য, যে রকমে পারি মোটামুটি একটা শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের গোচর ও সহজলভ্য করা, না কিনা আমাদের উপদেশ দেওয়া হইতেছে অসম্ভব উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষাকে অতিমাত্র সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ এবং জনসাধারণের দুষ্প্রাপ্য করিয়া তোলা। কথার কথায় লোকে বলে, "মোটে মা রাঁধে না, তা তপ্ত আর পান্তা," আমাদের অবস্থাও দাঁড়াইয়াছে সেইরূপ। দেশের লোক গরীব, দুবেলা দুইমুঠা অন্ন জোটাইতে পারে না, দুই পাতা শাদা বাঙ্গালা লেখা পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে কিসের আদর্শে? না, বিপুলবৈভবশালী ইংলণ্ডের অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয় Oxford, Cambridge-এর আদর্শে! তাহা হইলেই হইয়াছে আর কি?

মূলতঃ তাহা হইলে প্রশ্নটি দাঁড়াইল এই, শিক্ষার বিস্তার বা ব্যাপকতা বেশী আবশ্যক, না শিক্ষার গভীরতা বা উচ্চতা অধিক প্রয়োজনীয়? এক কথায় শিক্ষার dimension বা আয়তন লইয়াই যত গণ্ডগোল; অর্থাৎ area না height, কোন্ দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত? গণিতের তরফ হইতে বলিতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে এই প্রশ্নের সমাধান শুধু এই প্রশ্নটুকু হইতেই হইতে পারে না, আরও কতকগুলি data আমাদের জানা থাকা দরকার। কি জন্য, কি উদ্দেশ্যে, আমরা area অথবা height বাড়াইতে চাই, ইহা না জানা থাকিলে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের দেশে বর্ত্তমানে শিক্ষার কি উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধে একটু বোঝাপড়া করা দরকার।

শিক্ষার এক যে চিরন্তন উদ্দেশ্য আছে, তাহা অবশ্য আমাদের দেশেও বর্ত্তমান আছে এবং সর্ব্বদাই থাকিবে। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের জন্য যে অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে সেই আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ লাভই বিদ্যার্জ্জনের চরম পুরস্কার—একথা ত সকলেই অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকার করিবে। বিশুদ্ধ যুক্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে শিক্ষার অবাধ বিস্তারের সপক্ষে ইহা ব্যতীত অন্য কোন যুক্তিতর্কের আবশ্যক হয় না। তবে ইহা ছাড়া আরও অনেক কথা শিক্ষার বহুল বিস্তারের সপক্ষে বলিবার আছে।

একটা ইংরাজী প্রবাদ বাক্য আছে—Knowledge is power; জ্ঞানার্জ্জনে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। অভিজ্ঞতা হইতেই উক্ত প্রবাদবাক্যের জন্ম। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে নিরক্ষর অজ্ঞ লোকের ভিতরেই অন্ধসংস্কার খুব বেশী রকম আধিপত্য করে; বিদ্যার অভাবে অবিদ্যার প্রকোপ একটু বিশেষ রকমেই হয়; নূতন নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলা, নূতন নূতন ভাব ও চিন্তাকে নিজের মনে স্থান দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে।

আজকালকার দিনে কৃষিবাণিজ্যে, যানে বাহনে, চলায় ফেরায়, জীবনের প্রায় সকল বিভাগেই অনেক রকম নূতন প্রণালী নূতন উপায় নূতন উপকরণ প্রচলিত হইতেছে। অজ্ঞাতের প্রতি স্বাভাবিক ভয় ও অবিশ্বাসের দরুণই হউক অথবা পিতৃপৈতামহিক আচার ও ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অতিমাত্র আগ্রহের দরুণই হউক আমাদের দেশের জনসাধারণ যাহারা মোটের উপর অজ্ঞ ও নিরক্ষর, তাহারা এই সব নূতন উপায় উপকরণ প্রভৃতি সহজে অবলম্বন কিংবা ব্যবহার করিতে রাজী হয় না। এই কারণে কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতির দ্রুত উন্নতি আমাদের দেশে হয় না।

ভাব ও চিন্তার বিষয় আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে অজ্ঞ লোকদিগের ভাবের ধারা এক বাঁধা খাদ ধরিয়াই প্রায় নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে। যে নূতন নূতন ভাবের প্রেরণা শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করে, তাহা অশিক্ষিত সমাজকে নিথর নিঃস্পন্দ রাখিয়া চলিয়া যায়। বাপ দাদার ব্যবসা পরিত্যাগ করা যেমন তাহারা মহাপাতক মনে করে বাপ দাদার ভিটা ছাড়িয়া যাওয়াও তাহারা সেইরূপ মহাবিপদ্ মনে করে। এবং নিজের ভিটার বা গ্রামের বাহিরে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে একটা বৃহত্তর সমাজ বা দেশ আছে, সে দেশ যে তাহাদেরই দেশ এবং তাহার প্রতি যে তাহাদের কর্ত্তব্য আছে বা থাকিতে পারে ইহা তাহারা কল্পনাও করে না।

বস্তুতঃ যে সকল বিষয় শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাহা যে অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট কিরূপ দুর্ব্বোধ্য জটিল ও অর্থহীন বলিয়া মনে হয় ইহা ভাবিলেও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু বাস্তবিক একথা অতিরঞ্জিত নহে। যে দেশভক্তি, বিশ্বপ্রেম, জনসেবা প্রভৃতি বড় বড় কথা এবং ভাব লইয়া আমরা সদাসর্ব্বদাই নাড়াচাড়া করিয়া থাকি, সেই সমস্ত ধারণা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের সম্পূর্ণ অগোচর। বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক

চিন্তা সমাজের মনকে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকা প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যে আর কোন বিষয়ে না হউক অন্ততঃ রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের দেশের লোক এখন অনেকটা বুদ্ধিমান্ ও আগ্রহান্বিত; এবিষয়ে অন্ততঃ গোড়াকার মোটামুটি ধারণা সকলেরই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাহাই? রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণ কিরূপ আগ্রহান্বিত, তাহা এইটুকু বলিলেই সুস্পষ্ট হইবে যে রাজনীতির একেবারে গোড়ার কথাগুলি কি, সেসম্বন্ধেও তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সেবিষয়ে কোন খবরও রাখে না।

একটি গল্প বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট এই গল্পটি শুনিয়াছি। আমাদের দেশের জনসাধারণ দেশ এবং রাজ্য বিষয়ে কিরূপ খবর রাখে, তাহা পরখ্ করিয়া দেখিবার জন্য তিনি একবার একটি ভদ্রলোককে দেশে পাঠান। ভদ্রলোকটি জনৈক কৃষককে জিজ্ঞাসা করেন, "বলিতে পার আমাদের রাজা কে?" কৃষক উত্তর করিল, "কেন, রাজা ইন্দ্রচন্দ্র।" ভদ্রলোকটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "না, না, সে রাজা নয়; যিনি এদেশের সকল রাজা মহারাজার উপর রাজা?" কৃষক অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "হ্যাঃ, ইন্দ্রচন্দ্রের বড় আবার রাজা আছে নাকি?" তাহার জমিদার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র যে বহুকাল স্বর্গগত, সে খবরও সে রাখে না, ভারতসম্রাটের বিষয় ত দূরের কথা। আমরা শিক্ষিতগণ ত এদিকে council এবং electorate লইয়া ভয়ানক ব্যস্ত।

আমাদের দেশে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত না হইয়া সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়াতে একটা ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের চিন্তাজগতের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। বলিতে গেলে এই দুই শ্রেণী, আচারে ও ব্যবহারে,

ভাষায় ও চেহারায় একরকম হইলেও যেন বিভিন্ন জগতের অধিবাসী। এই যে ব্যবধান ও কৃত্রিম দূরত্ব দেশের ভিতর সৃষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে, ইহা অশেষ অনিষ্টের আকর। একদিকে যেমন এই পার্থক্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তার ভিতরে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া পরস্পরের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি আবার অপরদিকে এই ব্যবধান শিক্ষাকেও ক্রমশঃ কৃত্রিম হইতে কৃত্রিমতর করিয়া তুলিতেছে। একজন শিক্ষিত লোকের রুচিপ্রকৃতি এত বদলাইয়া যায় যে সহজ ভাবে একজন অশিক্ষিতকে সে আপন করিয়া লইতে পারে না, তাহার সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে মিশিতে পারেনা; একেবারে নিরক্ষর কৃষকপূর্ণ গণ্ডগ্রামে গিয়া পড়িলে যেন জলে পড়িয়াছে বলিয়া মনে করে, কাহারও সঙ্গে নিজের ভাবের আদান প্রদান করিতে না পারায় জীবনটা দুর্ব্বহ বোধ করে। অশিক্ষিত লোকও ইহাদের নিকট হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ্ মনে করে। যদি কখনও কোন প্রবল জাতীয় আন্দোলনের বন্যায় শিক্ষিত অশিক্ষিতকে "ভাই" "ভাই" বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন, তাহা নিতান্তই অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় এবং অত্যন্ত নাটকীয় ও বিসদৃশ ঠেকে, এবং হঠাৎ অনুগৃহীত অশিক্ষিতও সেই ব্যবহারকে কিয়ৎপরিমাণে সন্দেহের চক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারেনা। ইহাতে রাগ করিবার কিছু নাই, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; যে ব্যক্তি সেই কৃষক-জীবনের শত সাধারণ সুখে দুঃখে একবারের জন্যও তত্ত্ব লয় নাই, একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই, হঠাৎ তাহারই স্নেহের আতিশয্য যে সেই কৃষকের নিকট আকস্মিক উৎপাতের মত মনে হইবে, এবং তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তাই বলিতেছিলাম যে এই ব্যবধান অতি মারাত্মক ব্যবধান; ইহা বর্ত্তমান থাকিতে কখনই কোন জাতীয় আন্দোলন আপনার পূর্ণশক্তি বিকাশ করিতে

পারে না। সমাজটা একটা top-heavy মাথাভারী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, এবং mechanics কোন সূত্র অনুসারেই তাহাকে stable করিয়া রাখিতে পারে না।

শিক্ষার অভাব হইতে সমাজের যে এই বলাপচয় ঘটে, তাহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়; কিন্তু ইহা ব্যতীত আর একদিকেও শিক্ষার এই বিষমতা বিষময় ফল প্রসব করে। এই বিষমতা শিক্ষিতের মনেও একটা অতি বিকৃত অভিমান আনয়ন করে। কথায় বলে, "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"। নিজের চারিদিকে সকলকেই অজ্ঞ নিরক্ষর দেখিলে কিঞ্চিৎ সাক্ষর ব্যক্তি যে নিজেকে সাক্ষাৎ শঙ্করাচার্য্য মনে করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আটদশটা পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে একটিমাত্র ছোকরা যদি matriculate হইয়া উঠিল, তবে সেই পণ্ডিত যে অন্য সকলকে মূর্খ ছোটলোক মনে করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিদ্যার একটা অভিজাত্য এই প্রকারে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। অন্যান্য আভিজাত্যের ন্যায় এ আভিজাত্যকেও বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করিবার কারণ দেখি না। বিশেষতঃ যখন আমাদের দেশে বংশের আভিজাত্যের সঙ্গে বিদ্যার্জ্জনেরও অপেক্ষাকৃত বেশী আগ্রহ ও সুবিধা থাকায়, এই দুই প্রকার আভিজাত্য প্রায় এক শ্রেণীর লোকেরই একচেটিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। কুলগৌরব ও বিদ্যাগৌরব যদি শ্রেণীবিশেষেই আবদ্ধ থাকে তবে সমাজে যে সাম্য ও democracy-র বহুল প্রচার সম্ভবপর নহে তাহা আর বিশদ করিয়া বুঝাইবার দরকার নাই। আর এই আভিজাত্যপ্রিয়তা লোকের পক্ষে এতই স্বাভাবিক এবং বদ্ধমূল যে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও ইহার কবল হইতে কদাচিৎ পরিত্রাণ পান। নিম্নশ্রেণী ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকে উচ্চশ্রেণীর অনেকেই তাই কতকটা অনুগ্রহ এবং বিদ্রূপের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

এই কারণেই আমরা অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিয়া থাকি যে যে সর্ব্বসাধারণে শিক্ষা পাইলে বাঁচিয়া থাকা দায় হইবে; এখনই চাকর বাকর পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে; যেগুলি পাওয়া যাইতেছে সেগুলিও বেজায় বেয়াড়া; তার উপর দুপাতা ইংরাজী পড়িতে শিখিলে ত আর রক্ষাই থাকিবে না। পাত্রে অপাত্রে সর্ব্বত্র সরস্বতীর অধিষ্ঠান ঘটিলে, সরস্বতীর আর দুষ্ট সরস্বতীর মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ থাকিবে না। আমাদের দেশে আবার এই উপদ্রব কেন? রামরাজ্যে শূদ্রকমুনি অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে শাণিত অসিসহযোগে শিরচ্ছেদপূর্ব্বক যমালয়ে পাঠান হইয়াছিল, তাই ত সেরাজ্য রামরাজ্য হইতে পারিয়াছিল। একেই তো দেবদ্বিজে ভক্তি এখন নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র সব একাকার হইবার যোগাড়। ইহার উপর আবার ছোটলোকদিগকে নাই দিলে তো তাহারা মাথায় চড়িয়া বসিবে। ছোটলোকদের এ আস্পর্দ্ধা অসহ্য।

ইহার উপর আর টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। তবে যাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারটাকে একেবারেই এভাবে উড়াইয়া দিতে চাহেন না তাঁহারা গম্ভীরভাবে বলেন, না, ছোটলোকদের দুপাতা বই পড়ানো কিছু নয়। উহাতে কি হয় জান? শুধু দাম্ভিকতা আসে, বাপ পিতামহের ব্যবসা করিতে তাহারা ঘৃণা বোধ করে; প্রাচীন শাদাসিধা বসনভূষণে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না, ফিন্‌ফিনে বাবুগিরি আরম্ভ করে। চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরিতে ইতস্ততঃ করে, বেণের ছেলে দাঁড়িপাল্লা ধরিতে লজ্জাবোধ করে, ধোপার ছেলে কাপড় কাচা দূরে থাকুক রজক বলিয়া পরিচয় দিতেই ঘৃণা বোধ করে। এই রকম হইলে কি কখনও সমাজ চলে? কথাই আছে, "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।"

পূর্ব্বেকার যুক্তিটি যদিও অকাট্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুক্তিটির ভিতরে বোধ হয় কিঞ্চিৎ ছিদ্র আবিষ্কার করা যাইতে পারে। যদিও ইঁহাদের কথা

আপাততঃ খুব যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়, তথাপি মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হয় এই ভাবিয়া যে, যেসব দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয় কিংবা নাই বলিলেই চলে, সেখানে কি চাষা ধোপা প্রভৃতি পদার্থ একেবারেই নাই, যত চাষাধোপাপাড়া কি এই অভাগা বঙ্গদেশেই? সাধারণবুদ্ধিতে ত মনে হয় যে বিলাত দেশটা যখন মাটির এবং বিলাতের লোকেরা যখন আহারাদি করিয়া থাকে, তখন চাষা থাকা ত আবশ্যক; এবং যখন বস্ত্রাদি পরিধান করিবার রীতিও আছে তখন ধোপাও অবশ্যম্ভাবী। তবে? তবে ইহার কারণ বোধ হয় এই যে সকলেই যদি লেখাপড়া জানে তাহা হইলে কিছু সকলেই নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোক সাজিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া চলিতে পারে না, কারণ সেস্থলে সংসার অচল হয়; কাজেই সমাজের যাহা যাহা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য তাহাদিগের মধ্যেই কেহ না কেহ সম্পন্ন করিয়া থাকে। অল্প লোক যেখানে শিক্ষিত সেখানেই শিক্ষিত হইয়া উঠিলে অভিজাত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা খুব প্রবল। এই কারণেই অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। শিক্ষা এবং বিদ্যা সমাজের প্রত্যেক স্তরে অনুস্যূত হইলে এই বিভীষিকার অপনোদন অনিবার্য্য।

কিন্তু প্রথম যুক্তিটি অকাট্য। রজক-তনয় এম্. এ. পাশ করিয়া কলেজে পড়াইতে আসিলে aristocratic ছাত্রগণ যদি বলে, "চিরটা দিন গাধার কাণ মলে এলে, এখন আবার আমাদের জ্বালাতে এলে কেন বাপু?" তবে তাহার আর কি উত্তর দেওয়া যায়? উত্তর অবশ্য একটা দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা ভদ্রতাবিগর্হিত, কারণ পূর্ব্বোক্ত aristocratic ছাত্রগণকে রজক-পালিত নিরীহ চতুষ্পদবিশেষের সহিত তুলনা করিতে হয়। তবে যে রকম mentality অথবা মনোভাব হইতে উক্ত প্রকারের যুক্তির উদ্ভব সম্ভবপর, সেই মনোভাবই শিক্ষার বহুল প্রসারের পক্ষে প্রধানতম যুক্তি। যে সাম্য মৈত্রী এবং সহানুভূতি সমাজের আদর্শ তাহা তখনই প্রকৃতরূপে সম্ভব, যখন শিক্ষাদ্বারা জনসাধারণের মনুষ্যত্ব সম্যক্‌রূপে

উদ্বুদ্ধ হয়। একদিকে অভিমান অন্য দিকে অপমান, একদিকে শক্তি অন্যদিকে অক্ষমতা, এরকম বিষম দ্বন্দ্বের উপর কোন সুস্থ সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। নেপোলিয়ন যে বলিয়া গিয়াছিলেন, "La carriere ouverte aux talents"—প্রতিভার পথ সর্ব্বথা উন্মুক্ত থাকা চাই—ইহাই সমাজের উন্নতির মূলমন্ত্র, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

শিক্ষার প্রসার না উচ্চতা, ইহার কোন্ দিকে জোর দিব, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে বাহির হইয়া শিক্ষার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কতক আলোচনা করিলাম। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে শিক্ষার প্রসারকে কিছুতেই আমরা বাদ দিতে পারি না, খাটো করিতে পারি না। বরং উচ্চতা সম্বন্ধে আমাদের আপাততঃ বেশী আন্দোলন না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু পরিধিকে কিছুতেই সঙ্কীর্ণ হইতে দিতে পারি না।

এই কথায় একটু ভুল বুঝিবার আশঙ্কা আছে। আমাদের মনে হইতে পারে, তবে বুঝি শিক্ষার উচ্চতা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে; সে বিষয়ে আর আমাদের কিছুমাত্র বলিবার বা চিন্তা করিবার নাই। কিন্তু সে বিষয়েও ততটা নিশ্চিন্ত হইবার বিশেষ কারণ ত দেখিতে পাই না। অনেক বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে উচ্চ শিক্ষার একটি বিশেষ সংজ্ঞার দিকে আমাদের কর্ত্তাদের ঝোঁক পড়িয়াছে। সংজ্ঞাটি যেমন মৌলিক তেমনই অভিনব। এই অভিনব সংজ্ঞানুসারে উচ্চশিক্ষা মানে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা, তাহার মানে উঁচু দালানে বসিয়া লেখা পড়া করা। দালানটি যত উচ্চ হইবে, এবং যত উচ্চ বেঞ্চির উপরে বসিয়া লেখাপড়া করা যাইবে, শিক্ষাও ততই উচ্চদরের হইবে। ইহা হইতে ন্যায়শাস্ত্রমতে এবং জ্যামিতিশাস্ত্রানুসারে ইহাই অনুমিত হইবে যে নীচু ঘরের মেজের উপরে পাটি বা মাদুর

পাতিয়া বসিয়া লেখাপড়া করাকে কথনই উচ্চশিক্ষা বলা যাইতে পারে না। আরও একটি প্রতিজ্ঞা অনেকটা corollary হিসাবে অনুমিত হয় যে উচ্চগৃহস্থিত বিদ্যালয়ে বসিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইলে ছাত্রের বাসগৃহটিও উচ্চ হওয়া চাই, নচেৎ dimension-এ মিলিবে না। কেহ যদি মনে করেন যে আমার এই উক্তিটি সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত, বস্তুতন্ত্রতাহীন এবং অতিরঞ্জিত, তবে আমি কেবল তাঁহাকে কলিকাতার কলেজ সমূহের প্রতি ও তৎসংলগ্ন হষ্টেলসমূহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলি। সে গুলি যে মূর্ত্তিমান্ বস্তু, তাহা তাহাদের গগনভেদী চূড়া অচিরেই সপ্রমাণ করিয়া দিবে। কাজেই সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার দুইটি পংক্তির সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এইপ্রসঙ্গে বলা যায়,

"যত ছোট ঘরে পড়ে ছোট লোকে
জানিবে সুনিশ্চয়।"

ইহাই শিক্ষার তৃতীয় dimension সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সিদ্ধান্ত।

শিক্ষার quality আজকাল quantity দ্বারাই বিশেষভাবে নির্ণীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণ স্কুল কিংবা কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেই সেই পুরাতন শুভঙ্করের কাঠাকালি বিঘাকালি কষিতে আরম্ভ করেন; ঘরগুলির আয়তন কত, কয়টা জানালা দরজা, কয়খানা বেঞ্চি এবং কতগুলি খড়খড়ি আছে এ সম্বন্ধে দস্তুরমত একটা আদমসুমারির ব্যবস্থা করেন; এবং কোন্ বিষয়ে কয় ঘণ্টা tutorial ক্লাস হইতেছে, batch প্রতি ছেলে কয় জন, এবং কত ছেলেই বা আইনমত বেতন দিয়া কলেজে পড়িতেছে, আর কতগুলিই বা বিনামাহিনা আপখোরাকী হইয়া লক্ষ্মীর অকৃপা সত্ত্বেও অন্যায় ভাবে সরস্বতীর কৃপাভাজন হইবার দুশ্চেষ্টা করিতেছে, তাহার একটা গুরুতর রকমের ফিরিস্তি তৈয়ার করেন। আমি বিশ্বাস করি যে, যে কোন গণিতজ্ঞ ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রের এবংবিধ প্রবল প্রতাপ এবং প্রভূত প্রয়োগ সন্দর্শনে পুলকিত

হইবেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে এই ভাবে শিক্ষার তৃতীয় dimension উচ্চতর করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহাতে পরম পরিতৃপ্ত হইবেন।

কি কি বিষয় পড়ানো হয় এবং কিভাবে সেগুলি পড়ানো হয়, আজকালকার কর্তাদের কাছে সেগুলি নেহাৎ অবান্তর বিষয় বলিয়াই মনে হয়। কত খানা এবং কত উঁচু বেঞ্চিতে বসিয়া ছেলেরা পড়া শুনা করে এবং কত লম্বা চওড়া ব্ল্যাকবোর্ডের উপরে মাষ্টার মহাশয় আঁক কষেন, তাহাই হইল আসল জানিবার বিষয়। ছেলেরা যে ভূগোল না জানিয়াই খগোল পড়িতে গিয়া বিষম গণ্ডগোল বাধাইয়া বসে, এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস কিছুমাত্র না জানিয়াই ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে কাহার কি আসে যায়? তাহাতে পরীক্ষায় পাসের তো কোন বাধা হয় না।

তবে তাহাতে শিক্ষার উচ্চতা বিধান হয় কিনা তাহাই বিবেচ্য। জ্যোতিষের ক্লাসে একদিন আমি আট্‌লান্টিক মহাসাগরের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে ছাত্রবৃন্দ এমনি ভাব দেখাইল যেন তাহারা সত্য সত্যই সেই মহাসাগরে পড়িয়া তাহার অতল অন্ত আর খুঁজিয়া পাইতেছে না, এবং frigid zone সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে এমনই জড়সড় ও সঙ্কুচিত হইয়া বসিল যেন মেরুপ্রদেশের তুহিনশীতল বায়ু তাহাদিগকে একেবারে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আর একটি বালককে, যখন সে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, বেলজিয়মের রাজধানী কি? সে অম্লানবদনে উত্তর করিল, হল্যাণ্ড। ইহার উপরে আর টীকা অনাবশ্যক। প্রাচীন ভৌগোলিক আমলের লোক আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না যে ভূগোল পাঠ একান্ত নিরর্থক ও নীরস। আজকালকার অভৌগোলিক যুগের ছাত্রেরা দার্দ্দানেল্‌স্‌, পোপোকাটেপেটেল, টেহুয়াণ্টেপেক, একন্‌কাগুয়া প্রভৃতি নামের হৃৎকম্পকারী বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইয়াছে বটে, কিন্তু

আবার পায়রামারিব (Paramaribo), মেরেখাব (Maracaybo), প্রভৃতি সুরসাল বস্তুর আস্বাদ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, একেই পৃথিবী গোলাকার, তারপর এই ভূগোলের অভাবে, সেই গোলাকার পৃথিবীর উপরে দেশ মহাদেশ প্রভৃতির সংস্থান বুঝিবার প্রয়াসে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

তারপর ইতিহাস। ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়া রবিবাবু লিখিয়াছেন,

"ক্ষান্ত কর তব মুখর ভাষণ,
ওগো মিথ্যাময়ি।"

সুতরাং ইতিহাস বাদ দেওয়াতে সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাছাড়া, ইতিহাস শুধু যে মিথ্যাবাদী তাহা নহে, বিষম vulgar-ও বটে। প্রজাদিগের উপর কিঞ্চিৎ কঠোর শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রজাদিগের হস্তে ভগবানের প্রতিনিধি ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চাল্‌সের মুণ্ডপাত; প্রায় তদ্রূপ কারণেই ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইর শিরশ্ছেদ, এবং তারপর তথায় দাঁতোঁ, মারা, রোব্‌স্‌পিয়ের প্রভৃতি নরঘাতকের পৈশাচিক তাণ্ডব লীলা; আর বর্ত্তমান যুগে ছিন্নভিন্ন অরাজক রুশ সাম্রাজ্যের বুকের উপরে বসিয়া লেনিন ট্রট্‌স্কি প্রভৃতির মাত্‌লামি, এই সমস্ত অভদ্র এবং বীভৎস বিষয় যে শাস্ত্রে উল্লেখ করে এবং বর্ণনা করে তাহা সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের হস্ত হইতে অপসৃত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট সুরুচি ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

তবে এসম্বন্ধে বক্তব্য শুধু এই যে যখন বাদই দেওয়া হইল তখন পূরাপূরি বাদ দিলেই ভাল হইত; আধাআধি কাজ করায় বিশেষ কোন লাভ নাই। শিক্ষকদেরও ইহাতে আপদ্ চুকিল না; তাহাদিগকে সেই প্রাচীন রাজা আল্‌ফ্রেড হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বের মধ্য দিয়া ভিক্টোরিয়া যুগ পর্য্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস

বিবৃত করিতে হইবে; এবং Spanish Armada সম্বন্ধে ছেলেরা ঘুণাক্ষরে কিছু না জানা সত্ত্বেও Froude's Seamen of the Sixteenth Century পড়াইতে হইবে এবং পড়াইয়া পাস করাইতে হইবে। এইখানেই ত যত গলদ। ইতিহাস বন্ধ করিব, সাহিত্য পড়াইব, অথচ cramming-ও বন্ধ করিব—ইহা ত কোন শাস্ত্রে লেখে না। আমাদের উচ্চশিক্ষার বনিয়াদ কিন্তু এইভাবেই গড়িয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সকল বিষয়েই একটা জিনিষ আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই। মাষ্টাররা lecture দেন, ছেলেরা শোনে—এক কাণ দিয়া ঢুকিয়া যদি তাহার অধিকাংশই অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই—কারণ দুই কাণ দিয়া যাহা ঢোকে তাহার সবই যদি মাথার ভিতরে কিলবিল করিতে থাকিত তবে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত; কিন্তু যে বিষয় পড়ানো হইতেছে সে বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত অতি অল্প ছেলেই শোনে; মাষ্টার মহাশয় কোন্‌টা important বলিয়া দাগাইয়া অথবা বলিয়া দেন তাহা জানিবার জন্য তাহারা উৎকর্ণ হইয়া থাকে, আর important মানে কি যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাহার উত্তর—যাহা পরীক্ষায় আসিতে পারে। ইহা তবু গেল এক রকম মন্দের ভাল; কলেজে অর্থাৎ under-graduate ক্লাসে তবু দাগানো অংশ ছাড়াও ছেলেদের কিছু পড়িতে হয় কারণ মাষ্টাররা সব সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে Paper-setter থাকেন না। কিন্তু যে রীতিতে আজকাল post-graduate ক্লাসে এম্. এ. পড়ান হইয়া আসিতেছে, তাহা আরও চমৎকার। যিনি যে বিষয় পড়ান প্রায়ই তিনি তাহার পরীক্ষক থাকেন; তিনি যে কয় পরিচ্ছেদ পড়ান অথবা যে কয় খাতা নোট দেন তাহা হইতেই প্রশ্ন করেন; কাজেই পরীক্ষার ফল সকলেরই মনঃপূত হইয়া

থাকে এবং ঝুড়ি ঝুড়ি ফার্ষ্ট ক্লাস বাহির হয়। তাই বৌদ্ধধর্ম্মের বিখ্যাত ত্রিশরণের স্থলে উচ্চশিক্ষার মন্দিরে একটি মন্ত্রই প্রধান শরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,

"নোটং শরণং গচ্ছামি।"

উচ্চশিক্ষার যে যৌগিক এবং মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হইল তদনুসারে আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার জন্য যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে খুব উঁচুদরের বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ কলিকাতা মহানগরীতেও দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্ হইতে উচ্চতর দালান আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের শিক্ষার height-এর এই সুস্পষ্ট চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও ইহার উচ্চতা-নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন নিযুক্ত হইল।

কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমাদের উচ্চশিক্ষার ভিতরেও যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। বস্তুতঃ, যে শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষাকেই জ্ঞানলাভের মুখ্যতম উপায় ও উদ্দেশ্য বলিয়া দাঁড় করাইবে না, যাহা মানুষের অনির্ব্বাপ্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষাকে চিরদিন সন্ধুক্ষিত করিবে নিস্তেজ করিতে চেষ্টা করিবে না, মানুষকে নব নব রত্নরাজি আহরণ করিতে উত্তেজিত করিবে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইবে না, মানুষের হৃদয়ের রসধারাকে উৎসারিত করিতে থাকিবে শুকাইয়া ফেলিতে প্রযত্ন করিবে না—সেই শিক্ষাই প্রকৃত উচ্চশিক্ষা এবং আমাদের শিক্ষাপ্রণালী সে আদর্শের এখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। এই উচ্চশিক্ষার সহিত উচ্চ প্রাসাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; উচ্চশিক্ষার অছিলা করিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে এই প্রকৃত উচ্চশিক্ষার অমৃতরসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে ইহারও কোন অর্থ নাই; এই উচ্চশিক্ষার বেদী উন্মুক্তপ্রান্তরে নীল-চন্দ্রাতপ-তলে দরিদ্র-নারায়ণগণের উৎসব-কোলাহলের মধ্যেও রচিত হইয়া উঠিতে পারে।

যে dimension বা আয়তন ঘটিত সমস্যা লইয়া প্রবন্ধের আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই, বিস্তারকে প্রাধান্য দিব না উচ্চতাকে প্রাধান্য দিব? এবং তাহার সমাধান এই, উচ্চতাকে যত ইচ্ছা বাড়াইতে পার, কিন্তু তজ্জন্য বিস্তারকে যে কমাইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই; বরং বিস্তৃত ভূমির উপরে জ্ঞানমন্দির গঠিত হইলে মন্দিরের উচ্চতার দরুণ দৃঢ়তার বিষয়ে কোন আশঙ্কাই থাকিবে না। গগনস্পর্শী জ্ঞানমন্দির আপনার সুবিশাল ভিত্তির উপরে সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিরকাল জাতির গৌরব ঘোষণা করিবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪।

-:*:-

অর্থসমস্যা
ও
শিক্ষাসংস্কার

অর্থসমস্যা ও শিক্ষাসংস্কার

অমন যে কবি কালিদাস, কথিত আছে যে একদিন বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় তাঁহারও কবিত্ব শক্তির যথোচিত স্ফুরণ হইতে ছিল না ; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হেতু দর্শাইলেন, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"—সেদিন কবিবরের হাঁড়ীতে চাল বাড়ন্ত ছিল বলিয়াই কবির প্রতিভাও পড়ন্ত হইয়া আসিয়াছিল। কবিরা সর্ব্বত্রই অন্তর্দ্দর্শী ও স্পষ্টবাদী। সুতরাং প্রাচ্য মহাকবি যেমন অকপটেই অন্নচিন্তার চমৎকারিত্ব স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, পাশ্চাত্য কবি গ্রে-ও তেমনি মুক্তকণ্ঠেই chill penury-র প্রবল প্রতাপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সব কবিবাক্য সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই অল্পাধিক পরিমাণে বাস্তব সত্যে প্রতিফলিত হইতে দেখা গেলেও, আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশে ও বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত অথবা তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজের পক্ষে ইহার সত্যতা যেরূপ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি হইতেছে, তাহাতে এই কবি-বাক্যের যাথার্থ্য বিষয়ে আর কোন সংশয়ের অবকাশ পর্য্যন্ত থাকেনা।

আমি এই প্রবন্ধে অন্নসমস্যার ব্যাপক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই উৎকট সমস্যার উৎপত্তির মূলীভূত কারণ কি কি; কি কি ঘটনার পুঞ্জীভূত সমাবেশে এই অবস্থায় আমরা আসিয়া উপনীত হইয়াছি; এবং কি কি প্রণালী ও পদ্ধতির অনুসরণ করিলে ইহার একটা সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে—সমগ্র ভারতীয় সমাজের, এমন কি সমস্ত বঙ্গীয় সমাজের দিক্ দিয়া এবিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে অনেক বিবেচনা ও বিচার করিবার আছে; অত বড় বিষয়ের অবতারণা এই স্থলে করিবার অবকাশ নাই। শুধু বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের দিক্ হইতে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিতে কাহাদিগকে বুঝা যায় সেসম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না, কারণ অল্পাধিক অস্পষ্ট হইলেও একটা চলনসই ধারণা এবিষয়ে আমাদের সকলেরই একপ্রকার আছে, এবং সেই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই এই প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতে পারে। অবশ্য এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা যে একেবারে স্থির ও অনড় হইয়া আছে তাহা নহে। আজ যাহাদিগকে সাধারণতঃ ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করা হয় না, দুদিন বাদে হয়ত তাহারা ভদ্রলোকের কোঠায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে উপস্থিত হয়; এবং তাহার বিপরীতও ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। মোটামুটি বলিতে গেলে, আভিজাত্য, শিক্ষা ও অর্থশালিতা এই তিনেরই অল্পাধিক সমাবেশে এই তথাকথিত ভদ্রলোকের উৎপত্তি। এই তিন উপাদানের মধ্যেও আবার প্রথমোক্ত দুইটি গুণেরই প্রাধান্য বেশী লক্ষিত হয়; এবং এই দুইটির মধ্যেও তারতম্য করিতে গেলে দেখা যায় যে শিক্ষার উপরই "ভদ্রস্থতা" বেশী পরিমাণে নির্ভর করে।

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের ভিতরে ঐতিহাসিক কারণে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ভিতরেই শিক্ষার প্রচার হইয়াছে বেশী। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—ইহারাই

বহুকাল হইতে বিদ্বান্ শ্রেণী বলিয়া পরিচিত। ইহার কারণ সকলেরই সুবিদিত। হিন্দুসমাজ যে আচার ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে আবদ্ধ তাহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজে যে বিদ্যাবত্তা ও লেখানুশীলনের বেশী প্রচার হইবে, এবং তৎকারণে বংশপরম্পরাক্রমে ও আবেষ্টনের প্রভাবে ব্রাহ্মণসমাজ অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণধী এবং মেধাবী হইবে ইহা ত একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলিলেও চলে। এবং কতকটা কম পরিমাণে হইলেও, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজেও এই একই কারণে মানসিক উৎকর্ষ ও অনুশীলন অধিক। মুসলমান-আধিপত্যের সময়েও এই তিন শ্রেণী হইতেই বহুল পরিমাণে রাজকর্ম্মচারী ও লিপিকুশল কেরাণীর উদ্ভব হইত। এবং তারপর যখন বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ-আধিপত্যের সূত্রপাত হইল ও তৎসঙ্গে ইংরাজী-অভিজ্ঞ কেরাণী ও রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগ হইতে লাগিল এবং সেই রকম লোক পাইবার জন্য ইংরাজীশিক্ষার গোড়াপত্তন হইল, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-জাতির এই নূতন অবস্থার সঙ্গে থাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা ছিল বলিয়াই এই নবশিক্ষার প্রথম সুযোগ ও সুবিধা তাহারাই আয়ত্ত করিয়া লইল।

হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে সেই পরিমাণে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না বলিয়া ও মুসলমানসমাজে নবপ্রচারিত শিক্ষার প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল বলিয়া, ইহারা সে পরিমাণে এবং তত শীঘ্র সেই সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই; এবং পারে নাই বলিয়াই তাহারা অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে। সেই অনুন্নতি হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর ও মুসলমানসমাজ এখনও পূরাপূরি ভাবে দূর করিতে পারে নাই। কাজেই সুশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর যে সব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন সে সব বৃত্তিতে তাহারা এখনও পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে। আজ যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধবহ্নিতে সমস্ত প্রদেশ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল কারণও মুসলমানসমাজের এই ঐতিহাসিক শিক্ষাবিমুখতা ও তজ্জনিত অনুন্নতি; এবং হিন্দুসমাজের

নিম্নস্তরের ভিতরেও যে বিদ্রোহ-ভাব কতকটা লক্ষিত হইতেছে তাহারও অন্যতম কারণ ইহাই। অবশ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও অল্পাধিক পরিমাণে আছে, বলাই বাহুল্য।

সে যাহা হউক, হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষার উত্তরাধিকারের ফলে এবং ইংরাজীশিক্ষাকে তাঁহারা অত্যন্ত অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে শিক্ষিত সমাজ বলিতে যাহা বুঝি, হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীই তাহার মেরুদণ্ড। তাই বিগত শতবর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালায় যে সমস্ত আন্দোলন যে সমস্ত সমবেত প্রচেষ্টা, যে সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থের কীর্ত্তি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, রাসবিহারী, আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে মনীষিবৃন্দ বিগত শতাব্দ ধরিয়া জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে ধর্ম্মে সাহিত্যে বিজ্ঞানে রাজনীতিতে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন ও ভারতে বরেণ্য হইয়াছেন, ইঁহাদের সকলেই হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণী হইতে উদ্ভূত। এবং ইহা কিছুই অস্বাভাবিক হয় নাই, কারণ শিক্ষা ও অনুশীলন এই শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসারও এখন বাড়িয়া গিয়াছে; মুসলমানসমাজ ও হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর, যাহারা স্বেচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায় হউক পূর্ব্বে শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত ছিল, তাহারাও এখন শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইতেছে, ও তাহার ফলে শিক্ষিত সমাজের পরিধি দিনের পর দিন বিস্তৃততর হইতেছে; এবং তথাকথিত ভদ্রলোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যাহারাই দুই এক পুরুষ কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ

করিতেছে ও সহরে আসিয়া শিক্ষিতজনোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এবং আচারব্যবহারে পোষাকপরিচ্ছদে আদবকায়দায় উচ্চশ্রেণীর অনুসরণ করিতেছে, তাহারাই এক পুরুষে না হউক দুই পুরুষে ভদ্র-লোকের পদবীতে আরোহণ করিতেছে। নাগরিক সভ্যতার তুমুল স্রোতের ভিতরে পড়িয়া তথাকথিত নিম্নস্তরের লোক আপনাদের বিশিষ্টতা ও জাতব্যবসা হারাইয়া মসীজীবী ও সার্ট কোট-কোঁচাধারী ভদ্রলোক বনিয়া যাইতেছে। এবং এই বিপুলপুষ্ট ভদ্রলোকশ্রেণী দিনের পর দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে এবং অত্যধিক পরিমাণে ইংরাজীশিক্ষার অধিকারী হইয়া শিক্ষাভিমানীর চিরপ্রচলিত বৃত্তিগুলির প্রতি স্বভাবতঃই ধাবমান হওয়াতে বর্ত্তমানে একটা উৎকট বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

যখন শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল, যখন উচ্চশ্রেণীর লোকের ভিতরেও ইংরাজীশিক্ষা অতি অল্প লোকেই অনুশীলন করিত, তখন সেই সব ইংরাজী-শিক্ষিত লোক সহজেই যে রাজকার্য্য পাইত অথবা ডাক্তারী, ওকালতী, মাষ্টারী, প্রফেসারী, কেরাণীগিরি প্রভৃতি শিক্ষাসাপেক্ষ বৃত্তিতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্তু বর্ত্তমানে যখন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যা সহস্র গুণ বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু মনের সেই প্রাচীন সংস্কার ঘুচিয়া যায় নাই যে উপরিলিখিত বৃত্তিগুলিই শিক্ষিত ভদ্রলোকের বিশিষ্ট ও সম্মানিতভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায়—বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি হইতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার matriculate ও graduate পাস করিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু চাকুরীর ও ভদ্রলোকী বৃত্তির গণ্ডী যখন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—তখন অর্থনীতির চিরন্তন demand এবং supply-এর বিধি অনুসারে অর্থের বাজারে যে শিক্ষিতের দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে, এবং হাজার করা একজন যদি বা ঐ সব পন্থায় অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয়, আর নয় শত নিরনব্বই জন যে বিফলমনোরথ হইয়া বিষণ্ণ ও

ভগ্নহৃদয়ে কোনপ্রকারে অতিকষ্টে কাল কাটাইবে, তাহাতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যে ইস্কুল-কলেজে পড়ার ফলে পাস করিয়া বাহির হইলেই একটা ভাল চাকুরী জুটিয়া যাইত, অথবা একটা বড় উকীল বা বড় ডাক্তার হওয়া যাইত এবং সারা জীবন স্বচ্ছন্দভাবে থাকিয়া বংশধরদিগের জন্য প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রয়াণ করা যাইত, সেই ইস্কুল-কলেজেই তাদৃশ শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পাস করিয়াও যখন ২৫৲।৩০৲ টাকা মাসিক বেতনের কোন কর্ম্ম যোগাড় করিতেও গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয় এবং অনেক সময় পাওয়াই যায় না, এবং তথাকথিত সম্মানিত স্বাধীন ব্যবসায় ওকালতী ও ডাক্তারীতেও সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন যে শিক্ষাপদ্ধতির উপরে এবং সাধারণ ভাবে আমাদের আবেষ্টনের উপরেই একটা ধিক্কার ও বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাই স্বভাবতঃই এখন লোকের মনে হয় যে শিক্ষাপদ্ধতিই সেকেলে হইয়া গিয়াছে, এখন আর ইহা দ্বারা কাজ চলে না; চাকুরী ডাক্তারী ওকালতী প্রভৃতি মামুলী যে কয়েকটি বৃত্তি অবলম্বনে সুবিধা করিয়া দিবার জন্য শিক্ষা-প্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যই যখন সিদ্ধ হইতেছে না, এবং যখন অন্য জীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে নচেৎ বাঁচিয়া থাকিবার আশা নাই, তখন শিক্ষাপদ্ধতিকেও সেই নূতনতর উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে, শিক্ষার আমূল সংস্কার করিতে হইবে। তাই আজ vocational education বা বৃত্তিশিক্ষার নূতন নূতন experiment-এর জন্য দেশের শিক্ষিত সমাজ উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন ধীরভাবে প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে কি প্রকারে শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত হইলে এই কঠিন অর্থসমস্যার সমাধান হইতে পারে, এবং দ্বিতীয়তঃ বিচার্য্য এই যে শিক্ষাসংস্কার দ্বারা কতটুকুই বা

সমাধান সম্ভব। আমার বিবেচনায় এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্ন অপেক্ষাও গুরুতর এবং ইহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে শুধু চেঁচামেচিই সার হইবে, এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাসংস্কারের ফলে সমস্যাটির আশানুরূপ লাঘব না দেখিয়া আমরা অবসন্ন ও নিরাশ হইয়াই পড়িব। কাজেই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্যক্ আলোচনা অগ্রে হওয়া দরকার।

প্রশ্ন হইতেছে এই, শিক্ষাপ্রণালী জাতির অর্থসমস্যাকে কি ভাবে ও কতটুকু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে? জীবিকা ও অর্থার্জ্জনের উপায় বিবিধ। সমাজের সমস্ত লোকেই কোন না কোন প্রকারে নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতেছে; সব দেশে ও সব কালে ও সব অবস্থাতেই এইরূপ হইয়া থাকে; ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। তবে অবশ্য কেহ বা স্বচ্ছন্দে থাকে, কেহ বা কায়ক্লেশে কোনপ্রকারে কষ্টেসৃষ্টে নিজের ও পরিবারের প্রতিপালন করিয়া থাকে। কোন সমগ্র সমাজ ধরিতে গেলে, অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে এই জীবিকার উপায় কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য, এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে জীবিকার উপায় যাহাকে সচরাচর মাথার কাজ বলা হয় তাহাই—যাহাকে বাঙ্গালী সমাজে ভদ্রলোকের বৃত্তি বলিয়া ধরা হয়—অর্থাৎ রাজসরকারে চাকুরী, কেরাণীগিরি, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি। এবং স্বভাবতঃই এই শেষোক্ত জীবিকোপায়গুলি শিক্ষিত লোকেরাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, কারণ অশিক্ষিতের পক্ষে এই ভাবে জীবিকার্জ্জন করা অসম্ভব। যদি কোন একটা অনুপাতের অবতারণা করা যায়, তবে মোটামুটি এই রকম ধরিলে বেশী ভুল হইবে না যে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত লোক শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জন, এবং ভদ্রলোকী চাকুরী বা বৃত্তিতে লিপ্ত লোক শতকরা পাঁচজনের অধিক নহে। অবশ্য সমাজের অবস্থাভেদে ইহার অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে বোধ করি মোটামুটি এই রকমই অনুপাত হইবে।

এই দ্বিবিধ বৃত্তির মধ্যে প্রধান প্রভেদ বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তাতে নহে, প্রধান প্রভেদ এই যে প্রথমোক্ত বৃত্তিগুলি কার্য্যতঃ অসীম অথবা কেবলমাত্র সমাজের জনসংখ্যাদ্বারাই সীমাবদ্ধ; কিন্তু শেষোক্ত বৃত্তিগুলি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—সমাজের পক্ষে এই সমস্ত বৃত্তি ও ব্যবসায়ের যত-টুকু প্রয়োজন তাহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে।

কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই আহার আবশ্যক, কাজেই আহার্য্য পদার্থের উৎপাদন দরকার এবং; জনসংখ্যা যত বেশী আহার্য্যের পরিমাণও সেই অনুপাতেই বেশী। কাজেই এই আহার্য্য উৎপাদন, একস্থান হইতে অপরস্থানে আহার্য্যের চলাচল করা প্রভৃতি কার্য্যে অসংখ্য লোকের ব্যাপৃত থাকা দরকার। আহার্য্য ছাড়া আরও অনেক অবশ্যব্যবহার্য্য জিনিষ আছে যাহার উৎপাদন ও সরবরাহও সমাজের পক্ষে অবশ্যকরণীয়, যথা বস্ত্র, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র, আসবাব, ঘরদরজার মালমসলা ইত্যাদি। তাছাড়া, একেবারে আবশ্যক জিনিষ ব্যতীত এমন অনেক জিনিষ আছে যাহাকে বিলাস-সামগ্রী বলিলেও চলে, ভালর জন্যই হউক বা মন্দর জন্য হউক অর্থনীতির দিক্ দিয়া তাহাতে বড় একটা আসিয়া যায় না, সমাজ তাহা চাহে এবং তাহার উৎপাদন ও সরবরাহে বিস্তর লোকের ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, এক কথায় সমাজের আবশ্যক দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যাপারে সমাজের অধিকাংশ লোক ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য। এবং সমাজের চাহিদা যত বাড়ে, তাহা জনসংখ্যা বাড়িয়াই হউক বা অভাব ও জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়াই হউক, এই সমস্ত ব্যাপারীদের সংখ্যাও সেই অনুপাতেই বাড়ে। সুতরাং অন্নসমস্যা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোকদিকের পক্ষে খুব উৎকট হইয়া উঠে না। অবশ্য আকস্মিক দুর্ভিক্ষাদি কিংবা আর্থিক crisis বা দুর্যোগের কথা স্বতন্ত্র।

তবে একথা স্বীকার্য্য যে অস্বাভাবিক অবস্থায় কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদিগেরও দারিদ্র্য উপস্থিত হইতে পারে। যেমন, সাধারণতঃ কোন দেশে যে পরিমাণ লোক কৃষিকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে হঠাৎ যদি আরও বহু লোক নিজেদের জাতীয় ব্যবসায়, যথা শিল্পাদি, হারাইয়া সেই কৃষিকর্ম্মেই আসিয়া যোগদান করে, তাহা হইলে জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ বাড়িয়া যাইবে, আগে কৃষি হইতে জন প্রতি যত আয় হইত তাহা কমিয়া যাইবে, এবং অর্থাগমের অন্য উপায় দূরীভূত হওয়াতে দারিদ্র্য গুরুতর হইবে। আরও এক কারণে এরূপ হইতে পারে—দিনের পর দিন চিরপ্রচলিত আদিম প্রণালীতে কর্ষিত হইয়া নূতন নূতন উত্তম সারের অভাবে জমির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইতে পারে, দায়াধিকারের বিধি অনুসারে পুরুষপরম্পরায় জমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ হইয়া যাওয়াতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন নূতন যন্ত্রের সহযোগে intensive cultivation বা গভীরতর আবাদ অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে এবং কাজেই কৃষককুল দরিদ্রতর হইয়া পড়িতে পারে। আমাদের দেশে কৃষিজীবিগণের ভিতরে এই সকলপ্রকার অন্তরায়ই উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই অন্যান্য সুসভ্য দেশের তুলনায় আমাদের কৃষককুলের অবস্থাও শোচনীয়।

শিল্পকার্য্যে ব্যাপৃত শ্রেণীদিগেরও দুরবস্থা উপস্থিত হয় উন্নততর প্রণালীতে শিল্পোৎপাদনক্ষম দেশের সহিত প্রতিযোগিতায়। যেমন, পাশ্চাত্য দেশের কলকব্জা-যন্ত্র-পরিচালিত mass-production বা বিপুল দ্রব্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের দেশের শিল্পীদিগের কুটীর-শিল্পপ্রভৃতি বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবং ইহার প্রতিবিধান করিতে গেলে সেই আদিম হস্ত-পরিচালিত তাঁত চরকা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কারখানার প্রবর্ত্তন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

সে যাহাই হউক, এসব হইল প্রণালীর কথা—বস্তুতঃ যে মোটা কথাটা বলা হইয়াছে ইহাতে তাহার কিছু আসিয়া যায় না এবং সে কথাটা এই যে শিল্প-কৃষি-বাণিজ্যের প্রসারের কোন সীমা নাই, অথবা সমাজের যাহা সীমা ইহাদেরও তাহাই। তবে কত লোক কৃষির দিকে যাইবে, আর কত লোক বা শিল্পবাণিজ্যের দিকে যাইবে তাহা সামাজিক আবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। সব দেশেই, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, Industrial Revolution বা শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব্বে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ লোকই কৃষিতে লিপ্ত থাকিত এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই শিল্প-বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকিত। কাজেই জনসংখ্যা গ্রামেই ছিল বেশী, নগরে ছিল অত্যন্ত কম। আমাদের দেশে এখনও প্রায় সেই অবস্থাই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিগত একশত বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য অনেক দেশে এই অনুপাতের বহুল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; বহুসংখ্যক লোক কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া শিল্পবাণিজ্যাদিতে রত হইয়াছে; গ্রাম হইতে ক্রমেই নগরের দিকে লোক বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; এবং সভ্যতা ক্রমেই rural হইতে urban আকার ধারণ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ডেই এই ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এমন কি এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে নগরের লোকসংখ্যা গ্রামের লোকসংখ্যার দ্বিগুণ হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে নাগরিক জনসংখ্যা গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় বিশভাগের এক ভাগ। জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে শিল্প-প্রাধান্য আর নগর-প্রাধান্য এখনও অতটা হইয়া উঠে নাই; তবে ঝোঁক ঐ দিকে। আর যদি ঝোঁকের কথাই ধরা যায়, তবে আমাদের এই সব সনাতন প্রাচ্য দেশগুলি, ভারতবর্ষ, চীন, তুরস্ক, মিশর—ইহাদেরও ঝোঁক ঐ দিকে। সমাজের tendency বা গতি ঐ কৃষিপ্রধান হইতে শিল্পবাণিজ্যপ্রধান হইবার দিকে। তবে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই এই পর্য্যন্ত। যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য অসংখ্য লোকের

ংস্থান করিতে পারে এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার যে বৃত্তি—শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সব বৃত্তির দিকে স্বভাবতঃ ধাবিত হন—তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিছু কিছু প্রসার যে হয় না তাহা নহে, কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে তাহা নগণ্য বলিলেই হয়। রাজকার্য্যে এবং অন্যান্য চাকুরীতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোকেরই আবশ্যক হয়। ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি বৃত্তিতে সংখ্যা একেবারে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া নাই বটে, কিন্তু একটা স্বাভাবিক সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিয়া গেলে জীবিকার উপায়হিসাবেই ঐ বৃত্তিগুলি অতি নিকৃষ্ট ও নিরর্থক হইয়া পড়ে, কারণ গড়পড়তায় আয় এত কমিয়া যায় যে তদ্দ্বারা অধিক-সংখ্যক লোকের আর জীবিকা অর্জ্জন করা চলে না। কাজেই বহু লোক এই দিকে ধাবিত হইলে নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। তাই আমাদের দেশে শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে এই সব বৃত্তিতে আজ বেকার, বুভুক্ষা, অস্বাস্থ্য, ও অকালমৃত্যু এক রকম নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে; এবং শিক্ষার পদ্ধতি বদলাইয়া এই সমস্যার কিছু একটা সমাধান করা যায় কিনা এই বিষয় লইয়া সমস্ত শিক্ষিত সমাজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, "অন্নচিন্তা চমৎকারা।"

বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক প্রভেদ সম্বন্ধে এই যে আলোচনা করা হইল তাহাতে শিক্ষা-সংস্কার দ্বারা অর্থ-সমস্যা সমাধানের সাহায্য কতটুকু হইতে পারে তাহা তলাইয়া বুঝিবার সুবিধা হইবে। এবং তলাইয়া বুঝা দরকার। হঠাৎ বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাহা হাতের কাছে আসে তাহাকেই পরম অবলম্বন মনে করিয়া এবং সর্ব্বরোগমহৌষধি বোধ করিয়া তাহারই প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কাজ অধিক দূর অগ্রসর হয় না; পরন্তু উহা আশানুরূপ ফলদায়ক না হওয়ায় অনেক সময় অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও অবসাদেরই কারণ হইয়া পড়ে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবিষয়ে আমরা ভুক্তভোগী। আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় অসন্তোষ প্রকৃত ও স্বাভাবিক। এবং অসন্তুষ্ট ও অতিষ্ঠ হওয়ায় যে কোন মহাত্মা যে কোন অবধৌতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া বিবিধ অনুপান সহযোগে রাতারাতি রাজনৈতিক আরোগ্য আনিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন অমনি আমরা চোখ কাণ বুজিয়া বিচার বিবেচনার মাথা খাইয়া অম্লানবদনে সেই সব অনুপান ও মুষ্টিযোগ গলাধঃকরণ করিয়াছি। তাই তাহার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশেষ কোনই ফল হয় নাই, এবং নিষ্ফলতার নৈরাশ্য ও অবসাদ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে শিক্ষাসংস্কার দ্বারা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কতটা সম্ভব সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা দরকার এবং sense of proportion পরিপূর্ণমাত্রাতেই থাকা আবশ্যক; নচেৎ আজ এই পরীক্ষা করা গেল, কাল ঐ পরীক্ষা করা গেল, শিক্ষার অনেক রকম হেরফেরই হয়ত দেখা গেল, কিন্তু বিশেষ কিছু spectacular ফলোদয় না হওয়ায় আবার নৈরাশ্য আসিয়া ঘিরিয়া বসিবে, এবং তখন আমরা অবসন্ন হইয়া ভাবিতে থাকিব, নাঃ, ওসব শিক্ষাসংস্কার টংস্কার কিছু না, সব বাতিক, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব, কিছুতেই আমাদের আর উদ্ধার নাই। অসম্ভব কিছু আশা করিয়া বসিলে এই রকম হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাই বাস্তব তথ্যের সঙ্গে একটু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর উপর জীবিকার্জ্জনের উপায় কতটুকু নির্ভর করে এবং কতটাই বা করে না সে বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চাকুরীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ, তাহা কি সরকারী চাকুরী, কি প্রাইভেট চাকুরী, কি বণিক্-অফিসের চাকুরী; তাছাড়া, specialized

profession-এর ভিতরেও যাহার চাহিদা সমাজের পক্ষ হইতে খুব সঙ্কীর্ণ, তাহা টেক্‌নিক্যাল দিকেই হউক বা অন্য কোন দিকেই হউক, তাহাও স্বাভাবিকভাবে এক প্রকার সীমাবদ্ধ। কাজেই শিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালী—যাহাতে প্রধানতঃ literary এবং theoretical শিক্ষা দেওয়া হয়—যদি অনেকটা পরিবর্ত্তন করাও হয় বিশেষ বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা দিয়া, তাহা হইলেও যদি সমাজের তরফ হইতে সেই সব শিল্প-বৃত্তির চাহিদা বিশেষ না থাকে তবে সে শিক্ষাসংস্কারের দ্বারা শিক্ষিত সমাজের অর্থসমস্যার বেশী লাঘব হইবে না।

একটু details-এ নামা যাউক, তাহা হইলে আশা করি আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। আজ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের এই বেকার-সমস্যা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের মামুলী ভদ্রলোকী পন্থা ধরিয়া আর পেট চলে না তাহা অনুভূত হইতেছে। কাজেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের দিকে—যে দিকে চাহিদা অসীম—সে দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনেক কৃতবিদ্য শিক্ষিত ব্যক্তি সেই মামুলী প্রচলিত বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াই নানারকম ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্ করিয়াছেন, বইয়ের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনোহারী দোকান, সাবানের কারখানা, কাপড়ের কল, গেঞ্জিমোজার কল, ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন। অনেকে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অনেকে হন নাই, এবং যাঁহারা হন নাই তাঁহাদেরও কৃতকার্য্য না হইবার কারণ যে বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার অভাব একথাও অধিকাংশ স্থলে বলা চলে না। অধিকাংশ স্থলেই কারণ হইয়াছে পুঁজির অভাব, ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতার অভাব (যাহা কোন ইস্কুলের বৃত্তিশিক্ষা পূরণ করিতে পারে না), বিদেশী সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার অক্ষমতা, এবং অনেকস্থলে ব্যবসায়ে সাধুতার অভাব।

তাছাড়া, আমাদের দেশে নূতন নূতন ব্যবসায় ও শিল্প-বাণিজ্যের দিকে সরকারের উদাসীনতাও ব্যবসায়ের উন্নতি ও কৃতকার্য্যতার পথে একটা মস্ত বাধা হইয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ব্যবসায়ে আর্থিক সাহায্য, সংরক্ষণশুল্ক প্রভৃতি সরকার হইতে কিছুই করা হইত না। এখন অবশ্য জনমতের চাপে সরকার তাহাদের কর্ম্মপ্রণালী বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সংরক্ষণনীতি সরকারের কর্ম্মপ্রণালীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। তাহাতে ভবিষ্যতে উন্নতি কিছু দ্রুততর হইবে আশা করা যায়। অবশ্য সরকারের উদাসীনতার উপরই আমাদের অকৃতকার্য্যতার সমস্ত দায়িত্ব আরোপ করিয়া নিজেদের দায়িত্বের ভার এড়াইবার মোটেই আমি পক্ষপাতী নহি। কারণ সেই একই উদাসীন অথবা পরিপন্থী গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া যদি মাড়োয়ারী কি ভাটিয়া কি পার্শী বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে এবং আমরা না হইতে পারি, তবে তাহা আমাদের নিজেদেরই ত্রুটীর জন্য একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

যাহা হউক, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি শিল্প-বাণিজ্যাদির দিকে আকৃষ্ট হইল। স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত হইয়া থাকিলেও শিক্ষিত সমাজের এই ঝোঁকটাকে এই আন্দোলন আরও বলদান করিল। নিজেদের দেশের শিল্পের উন্নতি ও পুনরুদ্ধারের দিকে মনোযোগ পড়িল।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এই প্রাচীন বাণী গৃহে গৃহে উচ্চারিত হইতে লাগিল। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নিজেরা সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে যুবক-দিগকে নানা দেশে বিদেশে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যার্জ্জন করিবার জন্য পাঠাইলেন। নিজেদের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ ভাবে একটা বড়

টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান খোলা হইল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলেজগুলির বিজ্ঞান-বিভাগে হাজার হাজার ছেলে ঝুঁকিয়া পড়িল—অপ্রত্যাশিতভাবে বলিলাম এই জন্য যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধী যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞাননিয়ন্ত্রিত সভ্যতার প্রতি খড়্গহস্ত থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের আহ্বানে বালক ও যুবকদিগের বিদ্যালয় পরিত্যাগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রেরণা কতটা ছিল ঠিক বলা যায় না কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া যে চাকুরী-বাকুরী পাওয়া যায় না এই অর্থনৈতিক প্রেরণা অনেকটাই ছিল তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। কাজেই ছেলেরা ইস্কুল কলেজের মামুলী সাহিত্য-বিভাগ ছাড়িয়া দিয়া মহাত্মার হিন্দী ও চরকা ক্লাসে গিয়া ভর্ত্তি হইবার জন্য মোটেই ঔৎসুক্য দেখায় নাই; ভীড় করিল বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টি-টিউটে, সরকারী কমার্শ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে, টাইপ্‌রাইটিং-শর্টহ্যাণ্ডের ইস্কুলে, বাগবাজারের পলিটেক্‌নিকে, আর গোলামখানার আই.এস্‌-সি. ক্লাসে। এবং ছেলেদের অভিভাবকদিগের তরফ হইতেও উচ্চ কলরব উঠিল যে ইস্কুলগুলিতে বৃত্তিশিক্ষা চাই, চরকা তাঁত, ঝুড়ি বা টুকরি তৈয়ারী, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ্‌রাইটিং করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম উন্মেষের সময়ে বিদেশে নানাবিধ কলা ও কারুবিদ্যা শিখিবার জন্য যুবক প্রেরণ করিবার যে উৎসাহ, এবং অসহযোগ আন্দোলনের ফলস্বরূপ টেক্‌নিক্যাল ও বিজ্ঞান-বিভাগের উপর যে অতিরিক্ত ঝোঁক, কিছুকাল পরেই তাহা অনেকটা কমিয়া গেল। এমন কি, ইস্কুলের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু তাঁতীর কাজ, একটু মিস্ত্রীর কাজ, একটু কামারের কাজ ইত্যাদি বৃত্তিশিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য অভিভাবকদিগের এবং জনসাধারণের উৎসাহও অনেকটা মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্থরতা আমি মোটেই আশ্চর্য্যজনক

বা অমঙ্গলজনক মনে করি না। ইহা অবশ্যম্ভাবী ও ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। Scientific and Industrial Association হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া যে সব উৎসাহী যুবক আজ বিশ পঁচিশ বৎসর আগে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশে ফিরিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিছুদিন কোন স্বাধীন ব্যবসা ফাঁদিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া—এবং এই নিষ্ফলতা প্রধানতঃ মূলধন এবং কার্য্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবেই হইয়াছে—তারপর সেই চিরপ্রচলিত সরকারী কিংবা অন্য কোনবিধ চাকুরীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা চাকুরী পাইয়াছেন তাঁহারা এক হিসাবে তাঁহাদের অন্নসমস্যার সমাধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশ যাহা আশা করিয়াছিল তাহা পায় নাই। টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষিত সকল ব্যক্তির স্থান হইতে পারে এত বেশী কারখানা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানও দেশে নাই।

আসল কথা, টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা এবং দেশের শিল্পোন্নতি সমতালে অগ্রসর হওয়া দরকার; না হইলে যাহা হইবার তাহাই আমাদের হইয়াছে। দেশী ও বিদেশী ইস্কুল হইতে উচ্চশ্রেণীর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ হইয়া যুবকেরা বাহির হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নাই; নিজেদের বড় মূলধন নাই; অনেক কোম্পানী ফেল পড়াতে ধনীদিগের অর্থ অত্যন্ত shy; কাজেই নূতন প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করা অনেক স্থলেই হইয়া উঠে নাই এবং পুরাতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানও এত বড় ও এত বেশী নাই যে অন্ততঃ চাকুরী হিসাবেও সেখানে সকলের ঢুকিয়া পড়া যাইতে পারে। কাজেই আগেও যে সরকারী চাকুরী কি প্রফেসারী খুঁজিতে হইত পরেও তাহাই হইল। অসহযোগের পর যে টেক্‌নি-ক্যাল ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ঝোঁক হইয়াছিল তাহাও এই একই কারণে মন্দীভূত হইয়া গেল। এমন দিন ছিল যে টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে পাস করিয়া বাহির হইলে অন্ততঃ চাকুরী পাওয়াই যাইত। কিন্তু বহুসংখ্যক লোক বৎসর বৎসর তথা হইতে বাহির হওয়াতে সাধারণ বিদ্যার

দিকে যে বিপদ্ সেই বিপদ্ টেক্নিক্যাল লাইনেও হইয়াছে। এবং তাহারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় যে শত শত ছেলে ১৯২২-২৩ সনে কলেজগুলির বিজ্ঞান-ক্লাসে ভীড় করিয়াছিল তাহারা আই. এস্-সি. পাস করিয়া অতি অনুতপ্তচিত্তে আবার আর্ট্‌স্ কোর্স ধরিয়া বি. এ. পাশ করিয়া যথারীতি ল অথবা এম্. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া পূর্ব্ববৎই বি. এল্. কিংবা এম্. এ. হইয়া ওকালতী কিংবা মাষ্টারীর চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। এই সব ছেলেরা এখন sadder but wiser men হইয়া বাহির হইয়াছে; অন্ততঃ, wiser হউক বা না হউক, sadder যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রো নাস্তি।

শিক্ষাসংস্কারের জন্য সত্যসত্যই কোন চেষ্টা করিতে হইলে আমাদের বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের এই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা উড়াইয়া দিলে চলিবে না; পরন্তু এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। এই অভিজ্ঞতা হইতে অন্ততঃ এটুকু ধারণা নিশ্চয় হওয়া উচিত যে অবস্থার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক সন্দেহ নাই কিন্তু এই প্রণালী-পরিবর্ত্তন দ্বারাই যে শিক্ষিত শ্রেণীর অর্থসমস্যার বড় বেশী একটা কিছু সমাধান হইবে এরূপ আশা করার কোন হেতু নাই। দুই দিক্ দিয়াই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

প্রথমতঃ, যে সমস্ত বৃত্তি সঙ্কীর্ণ—এবং পূর্ব্বেই দেখিয়াছি শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত বৃত্তিগুলি অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত—যথা ওকালতী, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারিং, মাষ্টারী, প্রফেসারী, কেরাণীগিরি, সরকারী চাকুরী, ইত্যাদি—সেই সমস্ত বৃত্তিতে বহুসংখ্যক লোকের অন্নসংস্থান কখনই হইতে পারে না, তা বিদ্যালয়ে যত উৎকৃষ্ট প্রকার বৃত্তিশিক্ষাই প্রদত্ত হউক না কেন। আইন কলেজে উৎকৃষ্ট রূপে আইন পড়ান হউক, মেডিক্যাল কলেজে উৎকৃষ্টরূপে ভেষজ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হউক, টেক্নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা উত্তমরূপে দেওয়া হউক,

এসবই খুব ভাল জিনিষ সন্দেহ নাই ; কিন্তু অর্থসমস্যার সমাধানের হইতে ইহাতে কাজ যে খুব বেশী অগ্রসর হইবে তাহা নহে। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত চিকিৎসা-বিদ্যালয় এবং টেক্‌নিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল খুব বেশী বাড়ানো দরকার, কারণ দেশের অভাব মোচন করিবার জন্য এই সব বৃত্তিতে যত লোকের আবশ্যক তত লোক এদিকে এখনও আসে নাই। কিন্তু সেই পরিমাণ লোক এই সব দিকে আসিয়া পড়িলে পর—এবং আশা করা যায় যে দশ-পনের বৎসরের মধ্যে সেরকম অবস্থা বাঙ্গালা দেশে হইবে—আবার পুনরায় আমরা limit-এ বা সীমায় আসিয়া পড়িব ; স্থায়ী ভাবে অর্থসমস্যার সমাধান বড় বেশী একটা কিছু হইবে না। সুতরাং, যে বৃত্তিশিক্ষা এই সমস্ত প্রচলিত সঙ্কীর্ণ বৃত্তির জন্য উপযোগী করিয়া তুলে শুধু তদ্দ্বারা আর্থিক দুর্যোগের বিশেষ লাঘব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন হইতে পারে যে specialized বৃত্তিশিক্ষা দ্বারা যে শুধু নানাবিধ চাকুরীরই সুবিধা করা হইবে এমনই বা কি কথা ? লোকে যাহাতে উত্তরজীবনে স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে এই জন্যই ত বৃত্তিশিক্ষার দরকার। কথাটা সত্য ; এবং যদি বিদ্যালয়-প্রদত্ত বৃত্তিশিক্ষা লাভ করিলেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি স্বাধীন ও অসীম বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন সম্ভব হইত, তাহা হইলে শিক্ষাসংস্কারের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ কি তাহাই ? বিদ্যালয়ে specialized শিক্ষা পাইলে কিছু সুবিধা হয় তাহা ঠিক, কিন্তু সেই শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যে আরও কত শত কারণের উপর নির্ভর করে তাহা এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার পর আমাদের জানিতে কিছু বাকী আছে কি ? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Com., M.Com. পাস করা গ্রাজুয়েটরা, আমাদের টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা, বিদেশ-প্রত্যাগত

বিশেষজ্ঞ যুবকেরা তেমন কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়া পুনরায় সেই মামুলী চাকুরীর দিকে লালায়িত হইতেছেন কেন?

কারণ ত স্পষ্ট, শুধু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া বিশেষজ্ঞ করিয়া ছাড়িয়া দিলেই সবটা হইল না, বাহিরে শিল্পবাণিজ্যের তদনুযায়ী বিস্তার হওয়া চাই। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি বহুসংখ্যক থাকে তাহা হইলে এই সব বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; মূলধন যদি লজ্জা ছাড়িয়া বাণিজ্যের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ে, তবেই তাহার সাহায্যে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ নব নব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া নিজেদের ও সমাজের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন, নচেৎ একটা বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্ কি একটা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল কয়জন লোককে খাটাইতে পারে? শিল্পবাণিজ্যের জগতে এই যে অত্যাবশ্যক প্রসার ও পরিবর্ত্তন তাহা অতি অল্পাংশেই বিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর উপর নির্ভর করে এবং অত্যন্ত অধিক মাত্রাতেই অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করে—যথা, caste traditions বা জাতিগত সংস্কার, ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা, সাধুতা, মূলধনের সচ্ছলতা, ইত্যাদি। সুতরাং যদি স্বীকার করিয়া লওয়াও যায় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিলেই বৃত্তিশিক্ষায় বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়, তাহা হইলেও অন্যান্য আবেষ্টনের আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে শুধু শিক্ষাসংস্কার দ্বারাই বেশী দূর অগ্রসর হইবার কোন আশা নাই।

বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু তাঁত-চরকা চালানো বা হাতুড়ীপেটা বা করাতকরা শিক্ষা দিলেই যে ছেলেরা বিশেষজ্ঞ হইয়া এই সব ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে ইহাও আশা করা অসঙ্গত। অবশ্য এই সব হাতের শিক্ষার একটা নৈতিক মূল্য আছে। ছেলেরা তাহাদের সর্ব্বদা-পুস্তকনিবদ্ধ দৃষ্টি একটু এদিক্ ওদিক্ ফিরাইতে শিখে, একটু হাত চালাইতে অভ্যাস করে, কতকটা স্বাবলম্বী

হয়, কাজেই training ও discipline হিসাবে ইহার মূল্য আছে; যেমন অপরদিকে, সাধারণ সাহিত্য ও দর্শনশিক্ষার আর একপ্রকার অর্থাৎ cultural মূল্য আছে, এবং মানুষের মনের পক্ষে সে মূল্য খুব সামান্য নহে, এবং শুধু হাতুড়ীপেটা দ্বারা সে শিক্ষার অভাব পূরণ হয় না। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে যে সব বৃত্তিশিক্ষা—এই সব কামারগিরি, মিস্ত্রীগিরি, তাঁতীগিরি ইত্যাদি—ইহার কতকটা পূর্ব্বোক্তরূপ মূল্য থাকিলেও ব্যবসায়ে পারদর্শিতা হিসাবে মূল্য অতি সামান্য, এমন কি নাই বলিলেও চলে। কারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলে, যাহাদের জাতব্যবসা কামারগিরি বা মিস্ত্রীগিরি বা তাঁতীগিরি নয়, তাহারা যে শুধু বিদ্যালয়ে ঐ সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ঐ সব ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া জীবিকার উপায় করিবে তাহার আশা সুদূরপরাহত। কেবলমাত্র নৈতিক মূল্য হিসাবে এইটুকু লাভ হইতে পারে যে হাতের কাজকে তাহারা আর ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না, এই পর্য্যন্ত। অবশ্য ইহা কিছু কম লাভ নহে, কিন্তু অর্থসমস্যার সমাধানে যে ইহাতে বেশী কিছু সাহায্য হইবে এমনও নহে।

এই মাত্র যে কথা বলিলাম সে কথা অবশ্য শুধু সাধারণ ইস্কুলে আনুষঙ্গিক ভাবে বৃত্তিশিক্ষা দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; যে সমস্ত বিদ্যালয় specialized বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে একথা খাটে না। সেই সব বিদ্যালয় হইতে বিশেষজ্ঞ বাহির হইতে পারে সত্য; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই সব বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের স্ব স্ব অধীত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবেন কিনা তাহা আরও অনেক factor-এর উপর নির্ভর করে।

সুতরাং যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, তাহার সদুত্তর ইহাই যে শুধু শিক্ষাসংস্কার দ্বারা বিশিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার পথ কথঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে বটে, কিন্তু খুব বেশী কিছু যে হইবে তাহা নহে। আর্থিক সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান

করিতে হইলে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আমাদের জাতিগত বা শ্রেণীগত অভ্যাস ও ঝোঁক, এবং সরকারের শিল্প-বাণিজ্য-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিয়া তবে শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হইতে হইবে—তাহা হইলে আর নৈরাশ্যের কোন কারণ থাকিবে না। কারণ তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে শিক্ষাসংস্কারে অনেক উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা রাতারাতি millennium আনয়ন করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই; এবং অত্যধিক আশা না করার দরুণই হতোদ্যম ও অবসন্ন হইবার কোন কারণ ঘটিবে না।

প্রথম প্রশ্নের আলোচনা তখন ধীরভাবে করা যাইবে, কোন্ কোন্ দিক দিয়া শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার আবশ্যক? শুধু অর্থনৈতিক হিসাবেই নহে, শুধু জীবিকার্জ্জনের দিক্ দিয়াই নহে, কিন্তু culture-এর দিক্ দিয়া, humanism-এর দিক্ দিয়াও, কি উপায়ে শিক্ষা-পদ্ধতিকে পরিচালিত করা সমীচীন, এই গুরুতর প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার তখনই সম্ভাবনা হইবে। এই প্রশ্ন অতীব গুরুতর এবং ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের সুধীবৃন্দের মনোযোগ এই দিকে ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছে। ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে ও ধীরভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা হওয়া আবশ্যক; এবং আশা করি আমাদের সমাজের মনীষিগণ এই ভাবেই শিক্ষাসমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

——:*:——